উদ্ভাস

এপ্রিল ২০২২

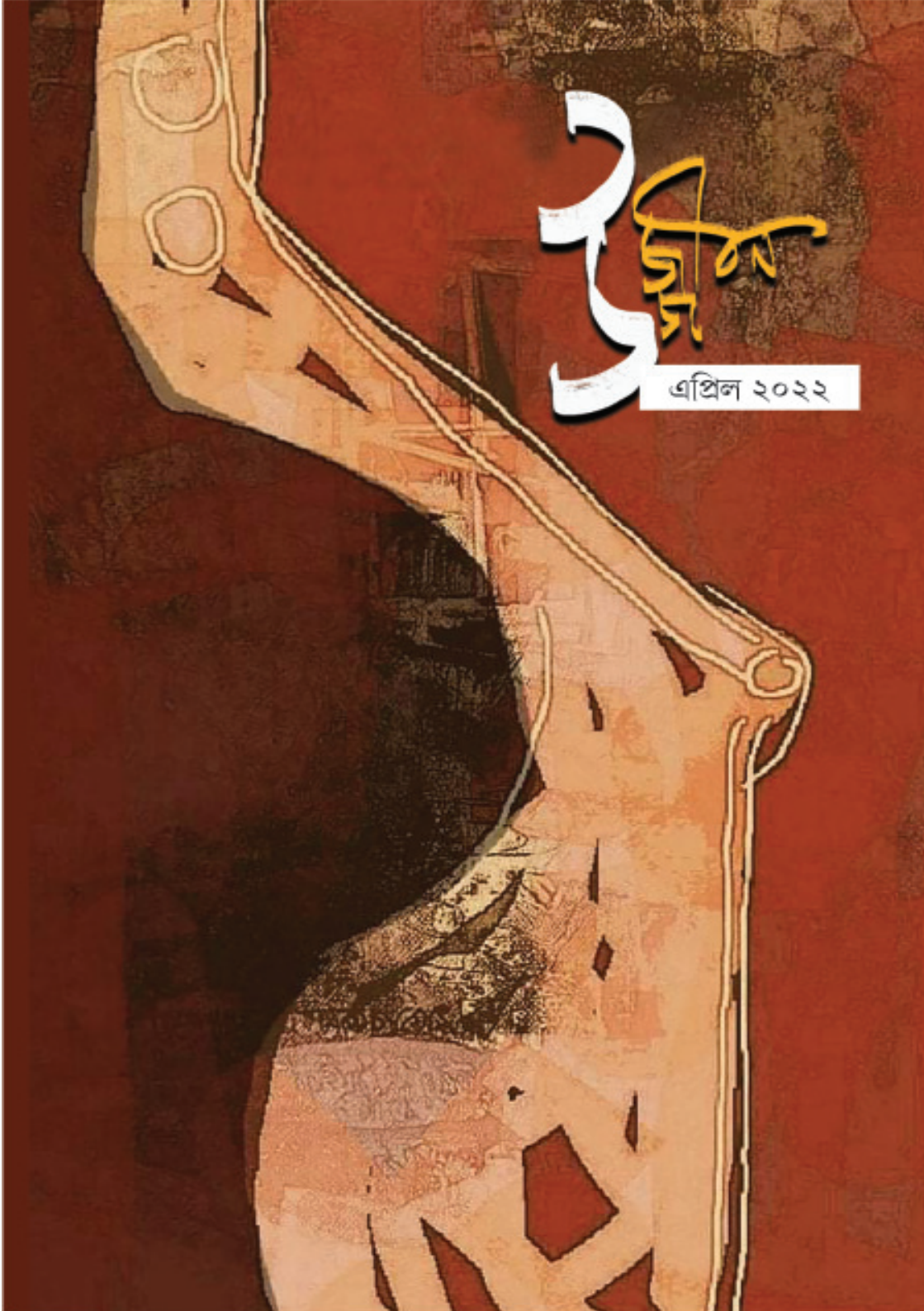

Al-Ameen Mission

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Ph.: 74790 20059
Central Office: 53B Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 74790 20076

SUCCESS AT A GLANCE : 2020

Dazzling Record in NEET (UG)

Marks 626 & above Within AIR 9908 **61**	Marks 600 & above Within AIR 20174 **134**	Marks 580 & above Within AIR 30431 **238**
Marks 565 & above Within AIR 39289 **322**	Marks 550 & above Within AIR 49260 **434**	Marks 536 & above Within AIR 59825 **516**

AIR 916 (675)
Jisan Hossain

AIR 1276 (670)
Tanbir Ahmed

AIR 1522 (666)
Md Samin

AIR 1982 (662)
Ayesha Khatun

AIR 2298 (660)
Al Tauloug

AIR 2817 (656)
Kanon Akhtar

AIR 2947 (655)
Md Tarip Sk

Higher Secondary (12th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBCHSE	Science	2090	909	1928	2072	2089
	Arts	79	43	66	78	79
CBSE	Science	54	8	24	43	54
	Total	2223	960	2018	2193	2222

Appeared 2223	
From Poor & BPL families	605 (27%)
From lower-middle income group	775 (35%)
From middle & upper middle income group	843 (38%)

81 students have occupied their positions within 20 ranks in the H.S. examinations of the Council

2nd 498 (99.6%) Md Talha

7th 493 (98.6%) Shayna Sultana

9th 491 (98.2%) Qasmed Akhtar

9th 491 (98.2%) K Abdul Halim

9th 491 (98.2%) Junaid Ahmed

Secondary (10th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBBSE	Boys & Girls	1706	461	1211	1557	1668
CBSE	Boys & Girls	71	21	48	64	70
	Total	1777	482	1259	1621	1738

Appeared 1777	
From Poor & BPL families	627 (35%)
From lower-middle income group	680 (38%)
From middle & upper middle income group	470 (27%)

15 students have occupied their positions within 20 ranks in 10th exam.

7th 686 (98%) S Md Tanveem

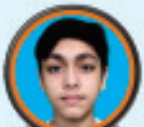
8th 685 (97.9%) Md Tahmuzzaman

15th 678 (96.7%) Mir Mosaraf

16th 677 (96.7%) Sk Arbaiz

17th 676 (96.6%) Sk Tafhim

To prepare yourself as an Ideal Teacher,
Join our Institutions...

M.R. COLLEGE OF EDUCATION

(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743234
www.mrctrust.org, Email- mrctrust2012@gmail.com
Phone- (03216)-261082, Mobile- 9933163040

SAHAJPATH

(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

BIRA, BALISHA, P.S- ASHOKNAGAR, (N) 24 PGS, WB-743702
www.sahajpath.org.in, Email- sahajpath2010@gmail.com
Phone- (03216)-260058, Mobile- 9932563040

MOTHER TERESA INSTITUTE OF EDUCATION & RESEARCH

(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

NADHIBAG, P.O- KAZIPARA, P.S- MADHYAMGRAM, (N) 24 PGS, KOL-125
www.mtiec.in, Email- secretary.mother@gmail.com
Mobile- 9051073449

DR. SHAHIDULLAH INSTITUTE OF EDUCATION.

(B.Ed. & D.El.Ed.)
Recognized by- NCTE, Govt. of India.
Affiliated to the WBUTTEPA & WBBPE.

ASHNPUR, P.O- SONDALIA, P.S- SASHAN, (N) 24 PGS, WB-743423
www.dsie.in, Email- secretary.dsie@gmail.com
Mobile- 9051072035

Founder
Dr. Jahidul Sarkar
Mobile- 9734416128 / 7001575522

মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত

আর নয় ভেলোর

M.R.HOSPITAL

Sharing Love, Caring Humanity

YOUR HEALTH IS OUR PRIORITY

আমাদের পরিষেবা সমূহ

- বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
- নিউক্লিয়ার মেডিসিন
- মেয়ের প্রাইস প্যাথলজি
- এন্ডোস্কপি
- ব্রাকিথেরাপি
- সি টি স্ক্যান
- সার্জিক্যাল ওয়ার্ড
- ই.এন.টি ও হেড নেক
- সার্জারি
- কেমোথেরাপি
- ডেন্টাল
- মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটি
- সার্জারি
- কেমোথেরাপি মেডিসিন
- কেমোথেরাপি সার্জারি
- নিউরো ও স্পাইন সার্জারি
- অপেন ও ল্যাপারোস্কপি
- সার্জারি
- অর্থোপেডিক
- গেস্ট্রোলজির
- স্ত্রী-রোগ
- হাই-রিস্ক প্রেগন্যান্সি
- গেস্টি মেডিসিন ক্লিনিক
- চোখের বাহ্যিক চিকিৎসা
- ও.পি.ডি
- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ.
- ২৪ ঘন্টার ইমার্জেন্সি ট্রিমা
- সেবার
- অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন (কোমর ও হাঁটু)
- অত্যাধুনিক ল্যাবোরেটরি
- ডায়াগনোস্টিক
- ইন্ডোর ও আউটডোরের পরিষেবা
- পেইন ক্লিনিক
- এক্স-রে
- ডায়ালিসিস
- ব্লাড ব্যাঙ্ক
- শিশু ও নবজাতক রোগ বিশেষজ্ঞ
- চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ
- শারীরিক উত্তাপ ও পুনর্বাসন
- ইউ.এস.জি
- বক্ষ রোগ বিশেষজ্ঞ
- চর্ম রোগ বিভাগ
- ডায়াবেটিসম
- AC/ICU আধুনিক পরিষেবা
- ভয়েস অ্যাটের মাধ্যমে চিকিৎসা
- কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত
- স্বাস্থ্য পরিষেবা
- সকল প্রকার Health Insurance

M.R. HOSPITAL

Vill. & P.O - Balisha, P.S. - Ashoknagar , North 24 Parganas,
Near Bira Rail Station West Bengal , Pin - 743234

9734214214
9051214214

24/7 Emergency Services

www.mrhospital.org

মাসিক

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর মুখপত্র

এপ্রিল ২০২২

কলকাতা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

কোষাধ্যক্ষ: মীর রেজাউল করিম

উজ্জীবন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

নির্বাহী সম্পাদক : জাহির আব্বাস, ইনাস উদ্দীন

সম্পাদক মণ্ডলী : অনিকেত মহাপাত্র, আজিজুল হক, আবু রাইহান, আমিনুল ইসলাম, তৈমুর খান, পাতাউর জামান, ফারুক আহমেদ, মীজানুর রহমান, মুসা আলি, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, শেখ হাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সুজিতকুমার বিশ্বাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী : আলিমুজ্জমান, খাজিম আহমেদ, জাহিরুল হাসান, মিলন দত্ত, মীরাতুন নাহার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকমান হাকিম, সামশুল হক, স্বপন বসু

প্রচ্ছদ : ওয়াসেফুজ্জামান (**নাম-লিপি :** সম্বিত বসু)

বর্ণ সংস্থাপন : বর্ণায়ন

বিনিময় : ৫০ টাকা

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭, ৯৪৩২৮৮০২৪২

ই মেল : aliahsanskriti@gmail.com, ujjibanmag@gmail.com,

ই মেল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

মীর রেজাউল করিম, ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (তৃতীয় তল), কলকাতা-১৪

'উজ্জীবন' আলিয়া-র পরিবর্তিত নাম

এখন আর একটা দিনও অতিরিক্ত বাঁচার নিট ফল বীভৎসতম সত্যের সঙ্গে আরও একপ্রস্থ সহবাস করা; হ্যাঁ এমনটা মনে করছেন অনেকেই। আশ্চর্য, তারপরেও তারা দিব্যি সময় কাটাচ্ছেন, বেঁচে রয়েছেন, টিকিয়ে রাখছেন তাদের সন্ততিদের। পাশাপাশি এমন নোংরাভাবে কালাতিপাত করার জন্য বেশ একটু হা-হুতাশের ধ্বনি অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত করছেন মাত্র।

সবমিলিয়ে ব্যাপারটা বেশ চমকপ্রদ বলে মনে হচ্ছে। তবে বিষয়টিতে কেউ যদি সেভাবে চমকিত না হন বা অন্য কোনো ভাবনাকে প্রশ্রয় দেন; বলতে চান—কোথাও কোনো ছন্দপতন হচ্ছে না, সবকিছুই তার নিজস্ব নিয়মে চলছে;যারা নিয়মের এই নামতায় এখনো সেভাবে রপ্ত হয়ে উঠতে পারেননি তাদেরকেই কেবল পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছে; তবে তাকে সোজা ব্যাটে সপাটে খেলে সীমানার বাইরে ফেলে দেওয়া যায় না হয়তো; কমবেশি প্রশ্রয় দিতেই হয় এই জাতীয় ভাবনাকে।

আসলে কখনো কখনো এমনও সময় আসে যখন অনিয়মের ঘোলা জলে ডুব সাঁতার কাটাটাই ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন যে কোনো মূল্যে, কোনোক্রমে টিকে থাকার চেষ্টা করি আমরা; মেনে নিতে বাধ্য হই যাবতীয় নেতি সত্যকে। কিন্তু কথা হল, এই মেনে নেওয়া কি সীমানাহীন হতে পারে!

কোনোক্রমে টিকে থাকা, এর নিহিত সত্যকে ধারণ করা এবং ভবিষত্যের জন্য তাকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা; এসব কিছুকে যারা শ্রেয় বলে মনে করেন তারাই আজ সংখ্যায় অধিক। এভাবে বেঁচে থাকার সূত্রে যে গরল উত্থিত হচ্ছে বা হবে তাকে ধারণ করার ভার ভবিষ্যতের হাতে ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ততাই যেন তাদের যাপিত জীবন-সত্য; ঐকান্তিক দর্শন।

তবে সত্যিই কি এভাবে বাঁচা যায়! তাছাড়া কী লাভ এমনি করে বেঁচে থেকে। তার থেকে একবার প্রবলভাবে জ্বলে উঠে, অন্যায়ের বুকে কাঁপন ধরিয়ে নিভে যাওয়াও বরং শ্রেয় নয় কি?

কী না ফসল ফলতে পারে এভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার পথে পথে। স্বপ্নকেও প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে হাতের মুঠোয়। ইতিহাস অন্তত তেমনি সাক্ষ্য বহন করে। কাজেই হতাশার গভীরে তলিয়ে না গিয়ে প্রচেষ্টার দিগন্ত বরাবর নিজেকে সম্প্রসারিত করে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হই আমরা; আপোষহীন অবস্থান নিই অসত্যের বিপরীতে, তা সে যতই প্রজ্জ্বলিত হোক।

সংসদ-বৃত্তান্ত

- এপার বাংলায় সংখ্যালঘু সমাজে সাংস্কৃতিক জাগরণ ও মননশীলতার প্রসার ঘটানো আমাদের লক্ষ্য।
- যা আমরা করতে চাইছি : একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ; সৃষ্টিশীল ও গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রকাশ, অন্তরালে থাকা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গের জীবনীমূলক গ্রন্থমালা প্রকাশ; অপরাপর ভাষায় রচিত তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করা, গুণীজন সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান, ধারাবাহিক অনলাইন আলোচনাসভার আয়োজন, সামাজিক গবেষণা পরিচালনা, মাসিক সাহিত্যসভা, আমাদের মধ্যে যারা সাহিত্যচর্চা করছেন তাদের নির্বাচিত কবিতা ও গল্পের বার্ষিক সংকলন প্রকাশ, সম্ভাবনাময় লেখকদের বই প্রকাশে বিশেষ সহায়তা দেওয়া, যারা সাংবাদিকতাসহ সামাজিক গণমাধ্যমে কাজ করছেন তাদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান প্রভৃতি।
- আগামী দিনের স্বপ্ন : কলকাতা শহরে নিজস্ব একটি স্থায়ী সংস্কৃতি-কেন্দ্র নির্মাণ; যেখানে থাকবে সংগ্রহশালা, উন্নতমানের গবেষণা কেন্দ্র, মিলনকক্ষ, অতিথি নিবাস ইত্যাদি।
- যা আমরা করতে পেরেছি-পারছি
  - ➠ সাহিত্যপত্রিকা আলিয়া ও উজ্জীবন (আলিয়ার পরিবর্তিত নাম) নিয়মিত প্রকাশ
  - ➠ গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ : *সোহরাওয়ার্দী পরিবার : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার*- আলিমুজ্জমান
  - ➠ জীবনীমালা প্রণয়ন : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, মুজিবর রহমান, ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী
  - ➠ ধারাবাহিক অনলাইন আলোচনাসভা পরিচালনা
  - ➠ গুণীজন সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান
  - ➠ প্রথম প্রকাশ নিঃশেষিত হওয়ার পর *সোহরাওয়ার্দী পরিবার : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার* এবং *মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'* বই দুটির এক সহস্র কপি করে মুদ্রণ
- যা সম্পন্ন করতে চলেছি
  - ➠ *চরিতাভিধান : বাংলার মুসলমান সমাজ* অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে
  - ➠ জীবনামালায় সংযুক্ত হতে চলেছে মাওলানা ভাসানি ও শাহাদাৎ হোসেন
  - ➠ শেখ কামাল উদ্দীন রচিত *নাট্যকার নজরুল* প্রকাশিত হওয়ার পথে
  - ➠ মুন্সী আবদুর রহিম এর গল্পসংকলন প্রকাশের কাজ চলছে
  - ➠ *নূরন্নেছা খাতুন রচনা সমগ্র* আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে
  - ➠ অনতিবিলম্বে চূড়ান্ত রূপ পেতে চলেছে মাদ্রাসা (রাজ্যসরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত) বিষয়ক ডকুমেন্টারি—'মাদ্রাসা শিক্ষা : জিজ্ঞাসা; প্রতীতি'
  - ➠ সংস্থার নিবন্ধীকরণের জন্য প্রস্তুতি চূড়ান্ত প্রায়
- যে লক্ষ্য থেকে এখনো অনেক দূরে : উত্তর সাতচল্লিশ পর্বে এ রাজ্যের মুসলমান সমাজের ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজের পরিসংখ্যান প্রণয়ন

উজ্জীবন এর জন্য যোগাযোগ

- **২৪ পরগনা-উত্তর**
  আমিনুল ইসলাম, ৯৪৩৩২৩১২০৪
  মশিহুর রহমান, ৮০১৭৩৪৩১৫৬
  হাকিমুর রশিদ, ৯৭৪৮৮৫১১৭৬
- **২৪ পরগনা-দক্ষিণ**
  আব্দুল আজিজ, ৮১৪৫৪৪৪১৯৫
  আসাদ আলি, ৯১২৩৬৮৯৬১৫
  মুসা আলি, ৯১৫৩১৩৫৪৬৮
- **কোচবিহার**
  মাহাফুল হোসেন, ৯৫৬৩৩৭৩১১৪
  সুরাইয়া পারভিন, ৮৭৬৮২৭৩৯১২
- **জলপাইগুড়ি**
  আরমান সেলিম, ৯০৯৩৮৮৫৫৪৬
- **দার্জিলিং**
  অঙ্কুর মহন্ত, ৯৬৪১২৪২৪১১
- **দিনাজপুর-উত্তর**
  আসফাক আলম, ৭৯৮০৪৩৪৬২৫
- **দিনাজপুর-দক্ষিণ**
  মীরাজুল ইসলাম, ৮৭৭৭৬৮৯৬৫১
- **নদীয়া**
  সাজাহান আলী, ৯৪৩৪২৪৫২৬২
  সুজিত বিশ্বাস, ৮৯১৮০৮৯৯৬৩
- **বর্ধমান-পশ্চিম**
  আমিরুল ইসলাম, ৯৮৩২৭৪৯২৮৭
  হালিমা খাতুন, ৭০৬৩৬৫৩৩১৩
  আশরাফুল মণ্ডল, ৯৪৭৫৯৩৮৩৬৬
- **বর্ধমান-পূর্ব**
  কারিমুল চৌধুরী, ৭০০১২৪৪২৮৮
  রমজান আলি, ৯৪৩৪০১৪১১৭
  সোমা মুখোপাধ্যায়, ৯৫৩১৫৯৮৬৫৩
- **বাঁকুড়া**
  ফখরুদ্দিন আলি আমেদ,
  ৯৪৭৬২৬৮৫৫৪
- **বীরভূম**
  ফজলুল হক, ৮২৪০৯৭৯০৯৩
  মেহের সেখ, ৮৫০৯১০২১৫৪
- **মালদা**
  জুলফিকার আলি, ৯৭৩৪১৯২১৭৫
  মহঃ আদিল, ৯৭৩৫৯৩৭৯৫০
  মহঃ ইব্রাহিম, ৮৯৭২৫১৯৮৭৯
  শাহ নওয়াজ আলম, ৭০০১২৭৪৯১৫
- **মেদিনীপুর-পশ্চিম**
  বিমান পাত্র, ৯৪৭৬৩২৯৩১২
  সেখ সাব্বির হোসেন,৯৬৭৯১৪৮১৭২
- **মেদিনীপুর-পূর্ব**
  ওয়াহেদ মীর্জা, ৯১৬৩৩৮৭৬৬৭
- **মুর্শিদাবাদ**
  আনোয়ারুল হক, ৯৭৩৫৯৪৭৯১১
  আলিমুজ্জমান, ৮৬৩৭৫৯৩৭৭২
  মহঃ বদরুদ্দোজা, ৮০১৬১৬১৭৬৫
- **হাওড়া**
  ইসমাইল দরবেশ, ৭০০৩৪৪৬৬৯৪
  সেখ নুরুল হুদা, ৯০৭৩৩১২১৮১
- **হুগলি**
  আনোয়ার সাদাত হালদার,
  ৮৯০২৪০৮৪২০
  মুজিবর রহমান, ৯৬৩৫৭০৬২২০
  সামসুজ জামান, ৬২৯০৯৫৬৪৫৪

উজ্জীবন : প্রাপ্তিস্থান

- ✯ অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ : বুক কর্ণার, ৯৪৭৫৯৫৩৩৪৫
- ✯ করিমপুর, নদীয়া : করিমপুর পুস্তক মহল, ৯৭৩৩৮১১৮১৯
- ✯ কলেজস্ট্রিট, কলকাতা : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, নিউ লেখা প্রকাশনী
- ✯ কৃষ্ণনগর, নদীয়া : বইঘর, ৯৭৩২৫৪১৯৮৪
- ✯ চাঁচল, মালদা : পুঁথিপত্র
- ✯ ডোমকল, মুর্শিদাবাদ : রিলেশন (বুকস্টল), ৯৭৩২৬০৯২১০
- ✯ দুবরাজপুর, বীরভূম : টিচার্স কর্নার
- ✯ বর্ধমান শহর, পূর্ব বর্ধমান : রমজান অ্যাকাডেমি, ৮৭৭৭৩৯৬৬৩২
  বিবেকানন্দ বুক অ্যান্ড জেরক্স সেন্টার, ৯৩৭৮১৩২৬৮৭
- ✯ বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা : সাহা বুক স্টল, ৯৮৩২৮০৬৬৬৩
- ✯ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ : বিশ্বাস বুক স্টল, ৯৮০০০০০০৪৯
  আদর্শ বুক সেন্টার, ৯৪৩৪৩৯৪৪৫২
- ✯ বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা : মল্লিক গ্রাফিক্স, ৯১৬৩৪৮৬৭৬৬
- ✯ বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : অন্নপূর্ণা বুকস হাউস, ৯৭৮৩৭৪৪৪৯৮
- ✯ বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর : কৃষ্ণ বুক হাউস, ৯৪৩৪৩৯৪২১২
- ✯ মালদা শহর, মালদা : পুনশ্চ, ৯১২৬৫২৩৭৫৪
- ✯ মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর : মল্লিক পুস্তক বিপণি, ৯৯৩২০৫৭৬৬৭
- ✯ শিলিগুড়ি, দার্জিলিং : ইকনমিক বুক স্টল
- ✯ সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ছাত্র সাথী, ৯৫৯৩৪৮২১৬৯
- ✯ সিউড়ি, বীরভূম : ভারত পুস্তকালয়

ইতিহাস। মুস্তাফা আবদুল কাইয়ুম। ৯

কবিতা। ইনাস উদ্দীন ২১, তৈমুর খান ২২, গোলাম রসুল ২৩, রাফিকুল ইসলাম ২৪, মহঃ আজাহারুল ইসলাম ২৪, অভিজিৎ মণ্ডল ২৫, ওয়াজেদ আলি ২৬, ওয়াহিদা খন্দকার ২৬, শ্রীধর সরকার ২৭, সর্বানী বেগম ২৭

উপন্যাস। মেকাইল রহমান। ২৮

গল্প। ফজলুল হক। ৪১ মুসা আলি। ৪৯ নবনীতা বসু হক। ৫৯

কথা । সৈয়দ রেজাউল করিম। ৭০

বঙ্গ-দর্পণ। বিকাশকান্তি মিদ্যা। ৭৭ আব্দুল বারী। ৮৪

বইচর্চা। পূর্ণেন্দু সিনহা। ৯০ সম্পাদক। ৯৩ আজিজুল হক। ৯৫

[আমরা আকাঙ্ক্ষা করি উজ্জীবন এর দর্পণে বিশেষ রূপে প্রতিবিম্বিত হোক আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি। বাংলার গ্রাম-গঞ্জের, এক একটি অঞ্চলের রয়েছে নিজস্ব সব ইতিহাস, ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের খনন ও নিষ্কাশন আমরা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বলে জ্ঞান করছি। এ প্রেক্ষিতে প্রাজ্ঞসমাজের অনুগ্রহ কামনা করি।]

নিবেদন

- বার্ষিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা দিয়ে মাসিক 'উজ্জীবন' এর গ্রাহক হন। এ বিষয়ে আপনার নিকটবর্তী প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
- আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের যাবতীয় প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য বার্ষিক ১০০০/- (এক হাজার) টাকার বিনিময়ে সার্বিক প্রকাশনা গ্রাহক হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। এই অর্থ এমনিতে অনুদানমূলক সহায়তা হিসেবে বিবেচিত হবে; পাশাপাশি এর সাপেক্ষে সংসদ প্রকাশিত 'উজ্জীবন' সহ যাবতীয় পুস্তক উপহার হিসেবে প্রদান করা হবে; যার অর্থমূল্য হবে এক হাজার টাকার বেশি।
- আমাদের এই পথচলায় আপনাকে সহযাত্রী ও সহকর্মী হিসাবে পেতে চাই। অনুরোধ থাকছে, সাধারণ অনুদানের পাশাপাশি বৃহত্তর লক্ষ্য রূপায়ণের লক্ষ্যে, বিশেষত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের সাপেক্ষে আপনার দেয় যাকাতের অংশবিশেষ, এককালীন বিশেষ অনুদান প্রদান করুন।

লেনদেন

A/C 31590592615
1FSC SBIN0001299
PHONEPE 7872422313
GPAY 9734662218
হোয়াটস্‌অ্যাপে (৮৬৩৭০৮৬৪৬৯) স্ক্রিন শট পাঠানোর অনুরোধ করছি
যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭, ৯৪৩২৮৮০২৪২
aliahsanskriti@gmail.com

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ প্রকাশনা

সোহরাওয়ার্দী পরিবার : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার—আলিমুজ্জমান
নেপথ্য নায়ক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন—খন্দকার মাহমুদুল হাসান (জীবনীমালা-১)
মৌলবি মুজিবর রহমান ও 'দ্য মুসলমান'—মিলন দত্ত (জীবনীমালা-২)
ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ও বাংলার নবজাগরণ—সামশুল আলম (জীবনীমালা-৩)
নূরন্নেছা খাতুন রচনা সমগ্র—মীর রেজাউল করিম (প্রকাশিতব্য)
চরিতাভিধান বাংলার মুসলমান সমাজ—সম্পাদকমণ্ডলী (প্রকাশিতব্য)

ইতিহাস

মুস্তাফা আবদুল কাইয়ুম

বারাসাত বিদ্রোহ

কলকাতা থেকে মাত্র ২৩ কি. মি. দূরে বারাসাত শহরের উপকণ্ঠে ১৮৩১খ্রিস্টাব্দে এক বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহ বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে নীলকুঠি সাহেবদের অত্যাচার, লবণ ঠিকাদারদের অত্যাচার স্থানীয় কৃষকদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে; তার উপর জমিদারের উৎপীড়ন তো ছিলই।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর সাম্য ও মৈত্রীর উচ্চ আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। তাঁর প্রচার এই বিক্ষোভে ইন্ধন যোগায়, যেমনভাবে একদিন ইংল্যান্ডের কৃষকদের বিক্ষোভের পথ খুলে দিয়েছিল লোলার্ড নামধারী একদল ধর্মপ্রচারক।

ধর্মপথে চলেই মীর নিসার আলী যাবতীয় প্রেরণা-অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ শহিদ-কৃত ইসলামিক পুনরুজ্জীবন সমগ্র ইসলাম জগতে এক পিউরিটান মেজাজ আনে। সেই পিউরিটান ইসলামিক মেজাজই মীর নিসার আলীর প্রেরণার উৎস। তাঁর আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল ইসলামের পুরনো দিনের গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনা এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তার যে অবক্ষয় সূচিত হয়েছে তা প্রতিরোধ করা। ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে তিনি কিছু কিছু মানবতাবাদী ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সারকথা হল, তাঁর ধর্মসংস্কারের একটি আর্থ-সামাজিক রূপও ছিল। তিনি বাংলার কৃষকদের সংগঠিত করে ২৪ পরগনা, নদীয়া, ফরিদপুর জেলাতে কৃষকরাজ কায়েম করে ফেলেছিলেন। আধুনিক অস্ত্র সম্ভার তাঁর ছিল না। কিন্তু বাংলার প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই পনেরো হাজারেরও বেশি সংখ্যার সৈন্যবাহিনী তৈরি করে ফেলেছিলেন। এই মুক্তি বাহিনী নিয়ে মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর রুখে দাঁড়ান জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে। এই জমিদার শ্রেণি, যাদের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান তারা সকলেই হিন্দু। আবার আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ 'হওয়া নীলকররা ছিল ইংরেজ, কিন্তু তাদের কলকারখানার ম্যানেজাররা ছিল অধিকাংশই হিন্দু। অর্থাৎ নীতিগতভাবে না হলেও বস্তুত তিতুমীরকে সরাসরি লড়তে হয় হিন্দুদের সঙ্গে।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি (১১৮৮ বঙ্গাব্দ ১৪ মাঘ) মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার হায়দার পুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) প্রায় পঁচিশ বছর পর এবং সিপাহী বিদ্রোহের পঁচাত্তর বছর আগে।

তাঁর পিতার নাম সৈয়দ হাসান আলী এবং মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। যতদূর জানা যায় বংশ পরিচয়ে তিতুমীর হজরত আলি (রা) বংশের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর এক পূর্বপুরুষ সৈয়দ আব্বাস আলী ওরফে পীর গোরাচাঁদ (রা) হজরত শাহজালালের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে সত্য ধর্ম প্রচারে রাজা চন্দ্রকেতুর সঙ্গে লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

হজরত শাহজালাল ও সৈয়দ আব্বাস আলির মোর্শেদ হজরত শাহ কবীর (রা) এর নির্দেশে পরবর্তীকালে সৈয়দ আব্বাস আলি ওরফে পীর গোরাচাঁদ (রা) এর অন্যান্য ভ্রাতা ও একমাত্র ভগ্নি যথাক্রমে—সৈয়দ শাহাদাত আলী, সৈয়দ হাসান আলী ও সৈয়দা জয়নাব ওরফে রওশন বিবি সত্য ধর্ম প্রচারার্থে ভারতবর্ষে আসেন। এঁরা বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার হায়দারপুর চাঁদপুর গ্রামে অবস্থান করেন এবং ভগিনী সৈয়দা জয়নাব ইছামতী নদীর পশ্চিমতীরে তারাগুনিয়া গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। সৈয়দ শাহাদাত আলীর বংশের ২৮তম অধস্তন সৈয়দ শাহ কদম রসুলের পুত্র সৈয়দ হাসান আলীর পুত্র হলেন সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

এই বংশের বংশগত উপাধি হল সৈয়দ। ১৮৩১ খ্রি. ২৫ নভেম্বর প্রকাশিত : দি ইন্ডিয়া গেজেটে 'শেখ' উপাধি বলা হয়েছে। সম্রাট দত্ত উপাধি হল 'মীর'। তিতুমীরের জনৈক ঊর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন সৈয়দ আবদুল্লাহ। ইনি দিল্লির সম্রাট কর্তৃক জাফরপুর পরগনার প্রধান কাজী পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'মীরে ইনসাফ'। তখন থেকে এই পরিবারের লোকেরা : মীর উপাধিতে ভূষিত হতেন। এ জন্য তারা সৈয়দ এবং 'মীর' উভয় পরিচয়েই সমধিক পরিচিত।

গ্রামের মক্তবে তিতুমীরের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এখানে মুন্সি লালমিয়ার কাছে আরবি, উর্দু এবং ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। বাংলা ভাষা, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষার পাঠ নেন পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্যের কাছে।

এ সময় সুদূর বিহার থেকে একজন বিখ্যাত আলিম হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ হায়দারপুর গ্রামে আসেন। তিতুমীরের পিতা সৈয়দ হাসান আলীর উদ্যোগে হায়দারপুর ও চাঁদপুর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে গ্রামবাসীরা একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। সেই মাদ্রাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বিখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ সাহেব।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিতুমীর হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ সাহেবের মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি আঠারো বছর শিক্ষা লাভ করেন। এই সময়কালে পবিত্র

কুরআন সম্পূর্ণ মুখস্থ করে হাফেজ হন তিনি। এছাড়া আরবি ব্যাকরণ, ফারায়েজ, হাদীস, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, তাসাউফ প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। সেই সাথে যুক্ত হয় বাংলাভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য।

শরীরচর্চা শিক্ষা : সেসময় খেলাধুলার পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা করা হত। শরীরচর্চার জন্য বিভিন্ন আখড়া ছিল। হায়দারপুর মাদ্রাসার সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বর্তমান। এখানেই আখড়া তৈরি হয়েছিল। শেখাবার জন্য নিযুক্ত হলেন গ্রামেরই একজন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক মহম্মদ হানিফ। তিতুমীর এই আখড়ায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন মস্তবড় কুস্তিগির ও মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিত হন।

পিতার মৃত্যুর পর তিতুমীর নদীয়ার জমিদার পালচৌধুরীদের আমডাঙ্গা কাছারিতে পাইক হিসাবে চাকরি গ্রহণ করেন ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে। তখন এক জমিদারের সঙ্গে অন্য জমিদারের বিবাদ লেগেই থাকত। জমিদারে জমিদারে কাজিয়া বেঁধে গেলে পাইক হিসাবে তিতুমীরও এক কাজিয়ায় জড়িয়ে পড়েন। কোনো কোনো গবেষক বলেন, এই কাজিয়ার প্রেক্ষিতে তাঁর কারাদণ্ড হয়। কিন্তু আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত

সেই প্রতিযোগিতার আসরে দেশবিখ্যাত দুই কুস্তিগীর পালোয়ান যথাক্রমে লাল মোহাম্মদ ও আরিফ আলি যোগ দেন। সেই দুই কুস্তিগীরের সঙ্গে তিতুমীর প্রায় আড়াই ঘণ্টা লড়াই করে তাদের দুজনকেই পরাজিত করেন এবং দেশের সেরা কুস্তিগীরের খেতাব প্রাপ্ত হন। অতঃপর তালতলা সহ সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে তিতুমীরের নাম। সময়টা ছিল ১৮১৪ খ্রি.।

হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি যশোর জেলে বেশ কিছু দিন বন্দি ছিলেন।

এরপর তিনি ওস্তাদ হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর সাথে কলকাতায় আসেন এবং কলকাতার তালিব টোলা অঞ্চলে (বর্তমান নাম তালতলা) অবস্থান করতে থাকেন। হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর দেশওয়ালী ভাই হাফেজ মুহাম্মদ ইসরাইল। সেখানেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয় এবং তিনি তালতলা আখড়া (বর্তমানে ওয়েলিংটন স্কোয়ার), মির্জাপুর মহল্লা আখড়া প্রভৃতি আখড়ায় কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ঠিক সেই সময় কলকাতায় জাতীয় পর্যায়ের এক কুস্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতার

আসরে দেশবিখ্যাত দুই কুস্তিগীর পালোয়ান যথাক্রমে লাল মোহাম্মদ ও আরিফ আলি যোগ দেন। সেই দুই কুস্তিগীরের সঙ্গে তিতুমীর প্রায় আড়াই ঘণ্টা লড়াই করে তাদের দুজনকেই পরাজিত করেন এবং দেশের সেরা কুস্তিগীরের খেতাব প্রাপ্ত হন। অতঃপর তালতলা সহ সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে তিতুমীরের নাম। সময়টা ছিল ১৮১৪ খ্রি.। বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক, তিতুমীর বা নারকেলবেড়িয়ার লড়াই, গ্রন্থের রচয়িতা বিহারীলাল সরকার তাঁকে পেশাদারী পালোয়ান বলে উল্লেখ করেছেন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণ : আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বরিশালের জবরদস্ত কামেল পীর হজরত শাহ কামাল (রা) এর কলকাতা খানকায় উপস্থিত হন তীতুমীর। তাঁর হাতে বায়াত হওয়ার পর তিনি দেশের বহু ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান, পীর-ওলি-আউলিয়ার মাজার পরিদর্শন করেন। তারপর কলকাতা ফিরে আর এক বিখ্যাত দরবেশ জাকী শাহ-র সান্নিধ্য লাভ করেন। এসময় কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটের 'সাহেব-ই-রাইস মোগল বংশীয় এবং দিল্লির শাহী খান্দানের লোক গোলাম আম্বিয়ার সাথে পরিচিত হন। নিঃসন্তান গোলাম আম্বিয়া সাহেব হজ্বে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন এবং যোগ্য সাথী হিসাবে তিনি মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীরকে বেছে নেন।

মক্কা জীবন : ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে গোলাম আম্বিয়া সহযোগে তিতুমীর হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। তবে এক্ষেত্রে সময়কাল নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে আবার কেউ বলেন ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে।

কোলভিন তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, 'আকস্মিকভাবে সাত-আট বৎসর আগে তিনি দিল্লির এক রাজপরিবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁরই সঙ্গী হিসাবে মক্কায় হজ্ব করতে যান।' কোলভিনের হিসাব ধরলে তাঁর মক্কা যাওয়ার সময় দাঁড়ায় ১৮২৪-১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ। তিনি মক্কায় সৈয়দ আহমদ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আর তিনি (সৈয়দ আহমদ) এক বছর পূর্ব থেকেই সেখানে হজ্ব করতে গিয়েছিলেন। 'সৈয়দ আহমদ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে মক্কা পৌঁছান এবং ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই হিসাব মতে তিতুমীরের হজ্ব যাত্রার সময় দাঁড়ায় ১৮২২ -১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ। কারো মতে তিনি মক্কা থেকে ফিরে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লি রাজপরিবারের সঙ্গে অবস্থান করেন এবং তারপর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। আবার কারো মতে তিনি মক্কায় ছিলেন দীর্ঘ চার বছর।

মক্কা শরীফে তিনি দুজন সাধক দরবেশের সাক্ষাৎ পান। তাঁরা হলেন, শাহ মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন, আর অন্য জন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী। তিতুমীর সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর নিকট চার তরিকায়—কাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দিদিয়া ও নকশবন্দিয়ায় মুরিদ হন এবং খিলাফত লাভ করেন। মক্কা শরীফে অবস্থান কালে তিনি আরও দুই মহান পাণ্ডিত্যের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁরা হলেন—শাহ

আবদুল আজীজ দেহলবীর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাইল এবং জামাতা শাহ আবদুল হাই। মক্কায় অবস্থান কালে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী তাঁর শিষ্যবর্গদের নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে কয়েকটি আলোচনাসভা করেন। এই আলোচনাসভায় দক্ষিণ বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে তিতুমীরের উপর।

সৈয়দ আহমদ নিজে তাঁর পরিচালিত সংগঠনের নাম 'তরিকা-ই-মোহাম্মাদীয়া' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর চিন্তাধারা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী-র ধ্যান-ধারণা প্রসূত। আল্লামা রুহুল আমিন (রা) বলেন, সৈয়দ সাহেব তরিকতে হজরত নবী (সা.) এর কদমের উপর ছিলেন, এই জন্য তিনি নিজ তরিকাকে মোহাম্মদীয়া বলতেন। ইহা কাদেরিয়া, চিস্তিয়া, নকশবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, শরওয়াদিয়া ইত্যাদি তরিকার অন্তর্গত।

প্রাসঙ্গিকভাবে 'ওয়াহাবী মতবাদ' সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। 'ওয়াহাবী' শব্দটি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া। এই শব্দ দ্বারা ইসলামের দুশমনেরা হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলন পর্যুদস্ত করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সংস্কারকামী যে কোন প্রচেষ্টার সামনে এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছে।

ওয়াহাবী মুসলমানদের কোনো ধর্মীয় ফেরকার নাম নয়। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে নজদ প্রদেশে উয়ায়না নামে এক স্থানে এক আলেম পরিবারে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নামে একজন সংস্কারক জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আন্দোলনের ফলে আরব ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের স্বার্থ মারাত্মক ভাবে বিপন্ন হয়। তাঁর আন্দোলন পরবর্তীকালে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে এবং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কাঠামো গঠন করতে সমর্থ হন তিনি। মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফও তাঁরা দখল করে নেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

আবদুল ওহাবের মৃত্যুর পর ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মিসরের শাসনকর্তা মুহাম্মদ আলী পাশা তুর্কী সৈন্যদের একটি

'ওয়াহাবী' শব্দটি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া। এই শব্দ দ্বারা ইসলামের দুশমনেরা হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলন পর্যুদস্ত করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সংস্কারকামী যে কোন প্রচেষ্টার সামনে এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছে। ওয়াহাবী মুসলমানদের কোনো ধর্মীয় ফেরকার নাম নয়।

বাহিনী নিয়ে প্রথমে মদীনা শরীফ এবং দেড় মাস পর মক্কা শরীফ দখল করে নেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর অনুসারীদেরকে মক্কা মদীনা সহ সমগ্র হেজাজ ভূমি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়।

হান্টার লিখেছেন, সৈয়দ আহমদ হজ্বে মক্কা শরীফে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু সময়ের হিসাবে তা কখনই ঠিক নয়। কারণ, সৈয়দ আহমদ হজ্বে যান ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে। আর তখন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব জীবিত নেই।

এছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের অনুসারীরা পবিত্র মক্কা ও মদিনায় এমন কিছু বাড়াবাড়ি করেছেন যা সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুসারীরা মোটেও সমর্থন করেন না। ওহাবীগণ পীর-মুরিদী জায়েজ মনে করেন না। কিন্তু সৈয়দ আহমদ আত্মশুদ্ধির জন্য পীরমুরিদীকে জরুরি মনে করতেন। ওয়াহাবীগণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা শরীফ সহ কোনো কবর যিয়ারত করার জন্য সফর করা বৈধ মনে করেন না; অপরদিকে সৈয়দ আহমদ পাক মদিনায় হুজুরের রওযা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা পুণ্যের কাজ বলে মনে করতেন। ওয়াহাবীগণ তাবিজ কবচ ব্যবহার করা জায়েয মনে করেন না, সৈয়দ আহমদ তা জায়েয মনে করতেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করতেন আর সৈয়দ আহমদ হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন।

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে সৈয়দ আহমদ দেশে ফিরে সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্যে প্রচার শুরু করেন। যখন তিনি শ্রীরামপুর আসেন তখন কয়েকজন পাঠান তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানান যে, পাঞ্জাবে শিখেরা বহু মুসলমান মেয়েদের বলপূর্বক বিবাহ করছে। এই অবমাননার প্রতিকার না হলে কেবল সংস্কার আন্দোলনে কি লাভ? এই সংবাদ অবগত হয়ে সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। শিখদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষে তিনি জয়ী হন। কিন্তু কয়েকজন সর্দারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শিখ ও ইংরেজদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হন শেষাবধি। অবশেষে ১৮৩১খ্রিস্টাব্দে ৬ মে বালাকোটের যুদ্ধে বহু সঙ্গী সহ সাহাদাত বরণ করতে হয় তাঁকে।

তিতুমীরের আন্দোলন : হজ্ব থেকে স্বগ্রামে ফিরে প্রথম দিকে তিতুমীর ধর্মীয় আন্দোলনের কাজে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। হায়দারপুর, চাঁদপুর, নওয়াপাড়া, রাজাপুর, হুগলি গাঁ, আটঘরা, সন্নিয়া, নারকেলবেড়িয়া, শিমলা, বিনারআটি, কীর্তিপুর, কলসুর, মান্দ্রা, যশাইকাটি, জঙ্গলপুর, শেরপুর প্রভৃতি স্থানে সভাসমিতিতে ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে কুসংস্কার ও অনৈস্লামিক কাজের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে থাকেন। তখন মসজিদ সংস্কার, নামাজ, রোজা, ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালন প্রভৃতির মধ্যে তাঁর আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল।

তিতুমীরের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অল্পকালের মধ্যে কয়েক শত লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। দেখতে দেখতে তাঁর মতাদর্শ নদীয়া ও ফরিদপুরেও ছড়িয়ে পড়ে। অচিরেই তিনি এক বিরাট সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তুলতে সমর্থ হন। তাঁর সমর্থকদের বেশিরভাগই ছিল কৃষক ও তাঁতী।

তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ত্রিমুখী।

(১) মুসলমানদের অধর্মীয় আচরণ থেকে বাঁচানো।

(২) শাসক ইংরেজদের ইঙ্গিতে পরিচালিত অত্যাচারী শোষক জমিদারদের হাত থেকে শোষিত হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের রক্ষা করা।

(৩) ভারতবর্ষকে ইংরেজ শাসন মুক্ত করা।

তিতুমীরের জনপ্রিয়তা, সুনাম ও সাফল্য স্থানীয় জমিদারের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় (কেষ্ট চন্দ্র), গোবরডাঙ্গার জমিদার শ্রী কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার শ্রী দেবনাথ রায়, ধন্যকুড়িয়ার জমিদার শ্রী রায়বল্লভ, তারাগুনিয়ার জমিদার শ্রী রামনারায়ণ নাগ, নাগরপুরের জমিদার শ্রী গৌরপ্রসাদ চৌধুরী, সরফরাজ পুরের জমিদার শ্রী কে. পি. মুখার্জি প্রমুখ তিতুমীরের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধি লক্ষ করে সমূহ বিপদের আশঙ্কা করে; তারা ছলে বলে কৌশলে তিতুমীরের প্রভাব প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

এই সমস্ত জমিদারদের মধ্যে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের ছিল বিরাট দাপট। বিশাল তার প্রতিপত্তি। জমিদার হিসেবে অত্যাচারী, দোর্দণ্ডপ্রতাপ। তিনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা করলেন। তার বিশ্বস্ত মুসলমান পাইক মতিউল্লা (যাকে তিনি মতিলাল বলে ডাকতেন) কে ডেকে বল্লেন, তিতুমীর ওয়াহাবী ধর্মাবলম্বী। ওয়াহাবী তোমাদের হজরত মোহাম্মদের ধর্মমতের পরম শত্রু, কিন্তু তারা এমন চালাক যে,কথার মধ্যে তাদেরকে ওয়াহাবী বলে ধরা যাবে না। সুতরাং আমার মুসলমান প্রজাদেরকে বিপথগামী হতে দিতে পারি না।

কৃষ্ণদেব রায়, কে. পি. মুখার্জি, রামনারায়ন নাগ এবং গৌরপ্রসাদ চৌধুরী একত্রিত হয়ে তিতুমীরের আন্দোলনকে চিরতরে খতম করার জন্য পাঁচটা বিষয়ে আদেশ জারি করলেন।

(১) যারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে, দাড়ি রাখবে, গোঁফছাঁটবে তাদের প্রত্যেককে দাড়ির ওপর আড়াই টাকা এবং গোঁফছাঁটার জন্য পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হবে।

(২) মসজিদ প্রস্তুত করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশ টাকা এবং পাকা মসজিদের জন্য এক হাজার টাকা জমিদারের নজরআনা দিতে হবে।

(৩) সন্তান-সন্ততি সহ আত্মীয় স্বজনের আরবি নাম রাখলে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হবে।

(৪) গো- হত্যা করলে হত্যাকারীর ডান হাত কেটে ফেলা হবে।

(৫) যে ব্যক্তি তিতুমীরকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেবে তাকে তার ভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

এই প্রেক্ষিতে তিতুমীর সংঘর্ষের পথে না গিয়ে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে শান্তির জন্য একটি পত্র দেন। পত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

বাবু কৃষ্ণদেব রায় জমিদার মহাশয় সমীপে,
পুঁড়ার জমিদার বাড়ী।

মহাশয়!

আমি আপনার প্রজা না হইলেও আপনার স্বদেশবাসী। আমি লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলাম যে, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমাকে ঐ অহাবী বলিয়া আপনি মুসলমানদের কাছে হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আপনি কেন এরূপ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারা মুশকিল আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই। যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার উচিত ছিল, সত্যের সন্ধান করিয়া হুকুম জারি করা আমি দ্বীন ইসলাম জারি করিতেছি। মুসলমানদিগকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতেছি। ইহাতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকিতে পারে? যার ধর্ম সেই বুঝে আপনি ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না অহাবী ধর্ম বলিয়া দুনিয়ায় কোন ধর্মই নাই। আল্লাহর মনপুত ধর্মই ইসলাম। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হইতেছে শান্তি। ইসলামী ধরণের নাম রাখা, গোঁফ ছোট করা, দাড়ি বড় করা, ঈদুল আজহার কুরবানী করা ও আকিকাতে কুরবানী করা মুসলমানদের উপর আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ। মসজিদ প্রস্তুত করে আল্লাহর উপাসনা করাও আল্লাহর হুকুম আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ, বিধিনিষেধের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমি আশাকরি আপনি আপনার হুকুম প্রত্যাহার করিবেন।"

আমিনুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি এই চিঠি কৃষ্ণদেবের কাছে নিয়ে উপস্থিত হন। সঙ্গে সঙ্গে আমিনুল্লাহকে গারদে ভরে প্রহার করা হল এবং ওই গারদেই তিতুমীরের আন্দোলনের অন্যতম সাথী আমিনুল্লাহ শহীদ হলেন। আমিনুল্লাহই তিতুমীরের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ।

এদিকে নিপীড়িত তাঁতী ও কৃষকরা তিতুমীরের কাছে জমিদারদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনতে থাকে। তিতুমীর তাদের খাজনা বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং একযোগে জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেন। তিতুমীর বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার শ্রমের ফল ভোগ করবে। এ অধিকার তার আছে। এ যেন সেই

সোজা সহজ সূত্র—লাঙ্গল যার জমি তার (The owner of plough is the owner of land). তিতুমীর বিশ্বাস করতেন, আপন শ্রমের ফল ভোগ করার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার আল্লাহই দান করেছেন মানুষকে। শরিয়ত বা ইসলামিক আইন মোতাবেক ব্যক্তি এই অধিকার ভোগ করার যোগ্য।

পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় সাফল্যের সঙ্গে সমস্ত কর আদায় করেছিল। কিন্তু জমিদার কে. পি. মুখার্জির পক্ষে সরফরাজপুর গ্রামে কর আদায় করতে খুব কষ্ট হয়েছিল। অবশেষে জমিদারের লোকজন মসজিদে নামাজ পড়তে বাধা সৃষ্টি করলো।

১৮৩২ খ্রি. ২৮ জুলাই শ্রীরামপুর মিশনারীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ইন্ডিয়া গেজেটের একটি রিপোর্ট পুনরায় ছাপা হয়—

সরফরাজপুর গ্রামে জোলাদের মাননীয় এক মসজিদ ছিল শুক্রবার এবং কোন কোন পর্বের দিনে তাহারা সেই মসজিদে একত্র হইয়া কর্ণে হস্ত দিয়া অতি চীৎকার ধ্বনি পূর্বক প্রার্থনার আহ্বান করিয়া থাকে। সেই গ্রামের জমিদার অর্থাৎ যাঁহার রাইয়ত ঐ জোলারা তাঁহার সেই মসজিদের নিকটে বাস ছিল অতএব তাহারা প্রার্থনা করিতে একত্র হইলে ঐ জমিদারের সন্তানেরা তাহাদের ঐ প্রার্থনার আহ্বান ধ্বনিকে বিদ্রুপ করাতে এবং তাহাদের প্রার্থনার অনুকরণ রূপ কোন নিরর্থক রূপ অর্থাৎ বিড়বিড় শব্দকরণেতে তাহারদিগকে পরিহাস করিত ঐ জোলারা পুনঃ পুনঃ ঐ বালকদিগকে নিবারণ করাতে তাহারা নিবারিত হইল না শেষে তাহাদের পিতা জমিদারের নিকটে ঐ দৌরাত্ম্যের বিষয়ে নালিশ করিতে গেল কিন্তু তিনি আপন পুত্রেরদিগকে শাসন না করিয়া নির্দয়তারূপে ঐ জোলারদিগকে দূরকরত স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া কহিলেন যে পুনর্বার যদ্যপি এমত নালিশ কর তবে আমি তোমাদের বিলক্ষণ প্রতিফল দিব ইহা দৃষ্টে ঐ বালকেরা আরো সাহসী হইয়া গর্বপূর্বক অধিক দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। তাহাতে জোলারা অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া ঐ বালকদিগের একজনের মুখে চপেটাঘাত করিল তৎক্ষনাৎ ঐ বালক রোদন করিতে করিতে আপন পিতার নিকট নালিশ করিতে দৌড়িল তাহাতে ঐ জমিদার তাহারদিগকে ধরিয়া নিকটে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন অতএব তাঁহার ব্রজবাসি লোকেরা চতুর্দিগে গিয়া কতক দোষীদিগকে ধৃতকরণপূর্বক আনয়ন করিল এবং তাহারা ওজোর করিয়া বালকেরদের অতিশয় দৌরাত্ম্য কহিতে লাগিল কিন্তু জমিদার তাহারদের সরদারকে ধরিতে আজ্ঞা দিয়া একজন হিন্দু নাপিত ডাকিয়া ঐ সরদারের দাড়ি প্রস্রাব দ্বারা মুড়াইয়া এবং যষ্টি দ্বারা তাহারদিগকে প্রহার করিল।

ঐ জোলারা বারাসাতের জাইন্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট নালিশ করিয়া ঐ দৌরাত্ম্যের প্রতিকার চেষ্টা পাইল কিন্তু আমলাগণ উৎকোচ প্রাপ্ত হওয়াতে তাহারদের বিষয় এমত ফেরফার করিল যে তাহাতে নালিশ একেবারে ডিসমিস হইল।

অতএব আদালতে নিরুপায় হওয়াতে তাহারা আসিয়া পুনর্বার আপনারদের মসজিদে প্রার্থনা করিবার সময়ে রক্ষা পাইবার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিল। অপর ঐ জমীদার অন্যায়ের সাফল্য দৃষ্টে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া প্রার্থনা সময়ে আরো ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া তাহারদের প্রতি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইলেন এবং একদিবস ঐ মসজিদে একটা শুকর ছেদন করাতে সেই স্থান অপবিত্র ও তাহারদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল। ঐ দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত তৎপর শুক্রবারে তাহারদিগের এক সভা হইল এবং তিতুমীর নামক ভ্রমণকারি এক ফকির তাহারদের নিকটে আসিয়া ঘোষণাকরত কহিলেন যে ধর্মরক্ষার্থে এবং পূর্বলিখিত তাবৎ দৌরাত্ম্য প্রতিকারার্থে ঐ জমিদার ও তাঁহার পরিবার নষ্ট করা উপযুক্ত।”

পরে এক শুক্রবারে মুসলমানরা যখন নামাজে রত ছিল তখন কৃষ্ণদেবের লাঠিয়াল বাহিনী মসজিদ ঘিরে ফেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। তিতুমীর বসিরহাট থানায় কৃষ্ণদেবের বিরুদ্ধে লুট ও মসজিদ পোড়ানোর অপরাধে এক নালিশ করেন। বারাসাত আদালতে কৃষ্ণদেব রায়ের পক্ষেই রায় হয়। তিতুমীর পর পর ১৮৩১ খ্রি. ১৫ জুলাই, ১৯ জুলাই, ২৭ আগস্ট ২৫ সেপ্টেম্বর আদালতের শরণাপন্ন হন। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রে রায় তিতুমীরের বিপক্ষে যায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক। অতএব সুবিচারের আশা সুদূর পরাহত।

শুরু হল অত্যাচারী গাঁতিদার ও জমিদারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। মরিয়া চাষীদের সামনে তিতুমীর অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানালেন। ২৩ শে অক্টোবর তিতুমীর তাঁর সমস্ত শিষ্যদের নারকেলবেড়িয়া গ্রামে সমবেত হবার আদেশ দিলেন। প্রথম আক্রমণ গিয়ে পড়ল পুঁড়া বাজারে। সেখানকার ব্যবসায়ী মহাজন লক্ষ্মণদেব, মোহন সাহা, গোলক সাহা প্রভৃতির দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হল। স্থানীয় হিন্দু মন্দিরে গোরুর রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে মসজিদে আগুন দেবার প্রতিশোধ গ্রহণ করল তীতু-পক্ষ। একের পর এক নীলকুঠি দখল করে প্রজাদের বায়নানামা, চুক্তিপত্রাদি পোড়াতে শুরু করে তারা। বাদুড়িয়ার কাছে শেরপুর গ্রামের ধনী মহাজন ইয়ার মহম্মদের বাড়ি থেকে প্রচুর টাকা সংগ্রহ হল। জঙ্গলপুরের নীলকুঠির সাহেব শিলিং ফোর্ডকে বাধ্য করা হল টাকা দিতে এবং জঙ্গলপুরের রামনারায়ণ পোদ্দারের বাড়ি লুঠ করা হল। নদীয়ার লাউঘাটি (বর্তমান নাম রাঘব কাটি। এ স্থান তখন নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল, বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা) সংঘর্ষে দেবনাথ রায় মারা গেল এবং তার ভাই হরদেব রায় সহ অনেকে আহত হল। এই এলাকার নীলকুঠির ওভারসীয়র স্মিথকে আক্রমণ করল চাষীরা। স্মিথ সাংঘাতিক ভাবে আহত হল এবং তার অনেক সঙ্গী মারা গেল।

পর পর কয়েকটি ঘটনায় তিতুমীরের জয়লাভ বারাসাত ও নদীয়া জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভীতির সঞ্চার করল। নীলকুঠীর সাহেব, জমিদার, কলিঙ্গা থানার দারোগা, বসিরহাট থানার দারোগা পুলিশ সবাই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল।

বিদ্রোহের প্রথম দিকে সরকারি কর্তৃপক্ষ তিতুমীরের আন্দোলনের ব্যাপারে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। পুঁড়া, লাউঘাটি, বারঘরিয়া প্রভৃতি কয়েকটা নীলকুঠি আক্রমণের পর বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পেল। বারঘরিয়া নীলকুঠির মিঃ স্টর্মের প্রতিনিধি মিঃ পিরন সব ঘটনা সরকারকে জানাল। ২৪ পরগনার কালেক্টর বারওয়েল ব্যাপারটাতে খুব গুরুত্ব দিলেন। বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার এবং নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ম্যাগটে তাদের ওপর আক্রমণের ঘটনা সরকারকে জানালো। ১৮৩১ এর ১০ নভেম্বর বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার তিতুমীরের বাহিনীর কাছে চরম বিপর্যয় স্বীকার করে নিলো এবং পালিয়ে সুন্দরবনের নদীপথে কলকাতায় পৌঁছলো। ম্যাজিস্ট্রেটের বিবরণ "After runing about five miles reached a Nallah where I was obliged to swim across and go on to Baduria at which place providently, obtained a boat and arrived at Bagundi at sunset."

একদিকে কোম্পানির সুদক্ষ সৈন্য আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, অন্যদিকে মুক্তি বাহিনীর হাতে লাঠি ও তরবারি ছাড়া কিছুই ছিল না। তিতুমীর বুঝলেন এভাবে কেল্লা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

এই লড়াইয়ে দশজন সিপাই, তেরজন বরকন্দাজ মারা গেল। বসিরহাট থানার দারোগাকে বিদ্রোহীরা বন্দী করে কেল্লার মধ্যে হত্যা করল। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট, গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং রুদ্রপুরের নীলকুঠির David Andrews এর সম্মিলিত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায় বনগাঁতে এবং সেখান থেকে কৃষ্ণনগর পৌঁছে অসহায় ম্যাজিস্ট্রেট কীভাবে পালিয়ে এসেছেন তার বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারকে জানান। ১৫ নভেম্বর ১৮৩১, ডেপুটি সেক্রেটারি ২৪ পরগনার কালেক্টর বারওয়েল কে নির্দেশ দিলেন কলকাতা মিলিশিয়া থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে পাঠাতে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ও ব্যারাকপুরের দেশীয় সৈন্য এবং দমদম ক্যান্টনমেন্টের কামান নিয়ে মেজর স্কট, ক্যাপটেন সাদারল্যান্ড এবং লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড প্রায় ৫০০ সৈন্য সহ নারকেলবেড়িয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৭ নভেম্বর রাতের অন্ধকারে বসিরহাট বারাসাত রাস্তার উপরে বাদুড়িয়ার অনতিদূরে মাটিয়াতে অবস্থান করল সৈন্য বাহিনী। ভোর তিনটায় মাটিয়া থেকে যাত্রা করে ১৮ নভেম্বর সকালের দিকে নারকেলবেড়িয়াতে পৌঁছে গেল সেনাবাহিনী। আলিপুরের কালেক্টর স্থানীয় জমিদার, নীলকুঠীয়ালদের আদেশ পাঠালেন সৈন্য বাহিনীকে সব রকমের সাহায্য দেবার; অপরদিকে তিতুমীরের পক্ষ থেকে জমিদারদের কাছে এবং নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিরোধ গড়ে না

তোলার আবেদন জানানো হয়। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। একদিকে কোম্পানির সুদক্ষ সৈন্য আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, অন্যদিকে মুক্তি বাহিনীর হাতে লাঠি ও তরবারি ছাড়া কিছুই ছিল না। তিতুমীর বুঝলেন এভাবে কেল্লা রক্ষা করা সম্ভব নয়। তবুও সার্বিক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বললেন সবাইকে। একবারও আত্মসমর্পণের কথা তাঁর মাথায় আসেনি 'সের দেগা, লেকিন আমামা নেহি দেগা।' ১৯ নভেম্বর ভোর বেলা ফজর নামাজ পর সমবেত মুক্তি সৈনিকদের সামনে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন তিতুমীর। "আমার ভাইয়েরা! আজ আমরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি ইংরেজ সিপাহিরা কেল্লার ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমাদের জীবনে আজ এক সোনালী দিগন্ত। আমরা ইংরেজদের এই দেশ থেকে তাড়িয়ে মানুষের হুকুমত কায়েম করবো। না হয় আমরা যুদ্ধে শহীদ হব। এতে আমাদের ভয় নাই। আর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা মানুষের ইচ্ছা তালিম করতে ভুলে যেও না। এ জন্য সব বিপদ আপদ মাথায় পেতে নিও।"

ভোরের সোনালী আলো তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। ইংরেজ সৈন্যরা গুলি বর্ষণ শুরু করল। কিন্তু জানবাজ দুঃসাহসী তিতুমীর বাহিনী তাতে একটুও দমে যায়নি। তিতুমীরের ভাগিনা গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে তাঁরা এগিয়ে গেলে ইট পাথরের আঘাতে প্রচুর ইংরেজ সৈন্য ঘায়েল হয়ে পিছু হটতে থাকল। তখন কর্নেল কামান যুদ্ধ শুরু করলেন। প্রথম কামানের গোলায় বাঁশের কেল্লার একটা অংশ ভেঙ্গে পড়লে তিতুমীর উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, "বন্ধুরা, বাঁশের কেল্লায় আগুন জ্বলছে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে বাঁশের কেল্লার পতন হলেও আমাদের লড়াই কিন্তু শেষ হবে না। তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও। শাহাদাতই আমাদের সর্বশেষ মঞ্জিল।" বুকে ঈমানী তুফান নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে কামানের দ্বিতীয় গোলায় তিতুমীর সহ অনেকেই কেল্লার মধ্যে মারা গেলেন। আহত হলেন কয়েক হাজার। আটশ জনকে বন্দী করল ইংরেজরা। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নির্দেশে বাঁশেরকেল্লার মধ্যে মৃতদেহগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য, যাতে তাদের স্মৃতি সৌধকে সামনে রেখে তাদের মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি কেউ শ্রদ্ধা জানাতে না পারে।

তিতুমীরের বারাসাত বিদ্রোহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। ড. মুমিন উদ্দিনের মূল্যায়ন— NAS GAR There is reason to believe that it was the self same grievances which gave birth to the mass leadership of A.K. Fazlul Huq, Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani and Sheik Mojibar Rahaman in course of the 20th Century.

পরবর্তীকালে এই উপমহাদেশে যাবতীয় আন্দোলন, বিদ্রোহ-বিপ্লব, সংগ্রাম ও সাধনার অগ্রদূত ছিলেন তিতুমীর। তিনিই ছিলেন প্রেরণার মূল উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর এই বিরাট সংগ্রাম ও মহান আত্মত্যাগের কাহিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কার্ল মার্ক্সের। তাঁর রচনায় উল্লেখিত হয়েছে তিতুমীর প্রসঙ্গ।

ই না স উ দ্দী ন

কবিতা

গোরস্থানের পথে

কাল সারারাত জানালার ধারে
বৃষ্টি পড়েছে
আমাদের গোরস্থানে যেতে হবে

কাল সারারাত ধরে মৃত্যু হয়েছে
মৃত্যুর কোনও ঝড় বৃষ্টি নেই
শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নেই
জানালায় সারারাত বৃষ্টি ঝরলেও
গোরস্থানে যেতে হবে, কারণ —
মৃত্যুর ডাক এসে গেছে

কে কার কবর খুঁড়বে?
গোরস্থান নিজেই শ্মশান
লাশ-লোভী কিছু ধূর্ত শৃগাল ছাড়া
কোন জীবিত মানুষ নেই
লাশেরা লাইন দেয় —
কখন দাফন হবে?
বৃষ্টিতে কাঁপছে শরীর
ঠান্ডাও লেগে যেতে পারে

যারা কাল সারারাত
জানালায় বৃষ্টি দেখেছিল
বিরহী রাধার মতো
ভেসেছিল পদাবলী সুরে
যারা কাল সারারাত স্বপ্ন দেখেছিল
স্বর্গ হতে শব্দেরা এসে
যাদের কবিতার পাতা ঘিরে ভিড় করেছিল
তারা আজ লাশ হয়ে গোরস্থানে লাইন দিয়েছে
কত নম্বর পরে তার
দাফনের ডাক আসে

তৈমুর খান

এই জন্ম

যে শব্দ গান হয়নি
আমি সে শব্দের কাছে যায়নি কোনোদিন;
যে মেঘ বৃষ্টি দেয়নি
আমি কি সেই মেঘের কাছে গেছি?
আমার শস্যের ক্ষেতে শব্দ আর গান
আমার মাথার ওপর মেঘ আর বৃষ্টির সম্মোহন।

এই জন্ম শুধুই বাঁশি
এ জীবন শুধুই ভেজা ভেজা অভিমান

দুপুর বিকেল হয়ে আসে
বিকেল রাত্রির ডাক পায়
গেরুয়া আলোর পথে নামে রাঙাচেলি
রাত্রিতে হেসে উঠবে অদ্ভুত জ্যোৎস্নায়!

বিশ্বাসের ধ্বনিগুলি বেজে ওঠে
অলৌকিক সমুদ্রের নৌকাগুলি ছেড়ে যায়
একে একে সমস্ত নাবিকেরা সাদা পোশাক পরে
আমিও ধূসর গন্ধ মুছে ফেলি মনে মনে

উপলব্ধির সব জানালায়
আমার আসক্তি তীব্র হলে
আবার আবার মেঘ জমে
শব্দেরা গান হয়ে ফেরে।

গো লা ম র সু ল

আয়নার ফ্রেমে একটি পোকা

জল্লাদের উপনিবেশ
ডানার ধারে সেই ভাগাড়
উন্মত্ত লালসা
পোস্টমর্টেমের টেবিলে বের করে রাখাছিল তোমার বিশ্বাস
যেখানে সহসা আমি খুঁজে পেয়েছি আকাশের চৌমাথা

তখন তুমি একটি দগদগে কঙ্কাল
যা বন্ধক দেওয়া ছিল চাঁদে
সে দিন ছিল চাঁদের হাটবার

গৌরব গাঁথা
কেঁপে উঠলো নিশুতি জল
হাতুড়ির ঘায়ে
আঙুলগুলো নৌকোর মতো আঁচড়ে নিচ্ছে জল
আর দেখেছিলে ছোটো জাতের নৌকাগুলো কিভাবে ডুবছিল

অনেক কিছু মনে আসছে আমার
রাস্তা অজগরের মতো চলে যেতো পিঠে করে নিয়ে চক্রাকার নির্বিষ
আমাদের ভালোবাসা আমাদের গায়ে জন্ম দিত শ্যাওলা
কবরেরা শান্ত থাকত মফস্বল গ্রামে
ওই রাস্তাটির ধারে

তথাকথিত বিখ্যাত একটি দুঃখ
আয়নার ফ্রেমে কাঁদছে একটি পোকা
আমি নৃশংসতার কথা বলছিলাম
সর্বজন শ্রদ্ধেয় একটি খবরের কাগজের এক বিখ্যাত খেলোয়াড়ের পাশে
তোমার প্রজাতান্ত্রিক ছবি

আকস্মিক আকাশ ভাঙা আমি
মর্গে তুমি উপবাস ছিলে
চড়ুই উড়ছিল

রা ফি কু ল ই স লা ম

মানুষ হবার স্বপ্ন

বছরের পর বছর দিশেহীনতায় কেটে যায়
অপশাসনের আর্দ্রতায়
অবহেলায় মরিচা পড়ে গেছে-
মাটির অক্ষরে,
কলুষিত হয়ে গেছে দেহ-মন
অরণ্যে রোদন বাছাদের-
শীর্ণকায় দেহে বিবর্ণ ইচ্ছা
নিস্তেজ নবপ্রাণ।
বর্ণ পরিচয়ে উইপোকার ঢিবি
দিনে ঘুগরে পোকার গঞ্জনা
নিরুপায় হয়ে খোঁজে উপায়;
কোরাপসনের অঙ্গনে ভিড়-
এক বিন্দু জীবনের আসায়
রেশনের মতো লাইনে দণ্ডায়মান-
আজ তারা যেন অমানুষ
যাদের স্বপ্ন ছিল একটাই
মানুষের মতো মানুষ হওয়ার!

ম হঃ আ জা হা রু ল ই স লা ম

স্থানান্তর অথবা ঈশ্বর উদাসীন

হাজার হাজার আত্মরা গভীর প্রশান্তিতে শুয়ে
আছে গোরস্থানে বিগত কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে,
চলমান সমাজের একপাশে; অদ্ভুত রহস্যে
ঢাকা নীরবতা;এক অর্ধভেদ্য অন্তরাল। তাঁরা
কি দেখছে আমাদের চুপিসারে অতিক্রম করে
যেতে এই পথ? আমাদের কোলাহল, সুখ, কষ্ট,

জীবন-যন্ত্রণা? তারাও তো চলেছিল একদিন
এই পথে, তাঁদের গাঁয়ের গন্ধ এখনও পড়ে
আছে ইটখোলা, তালতলার পুকুরঘাটে। লেগে
আছে মেঠো আলপথে তাদের শ্রমের ঘাম, জমি
খোঁজে ব্যথাতুর হৃদয়ে তাদের লাঙ্গলের শক্ত
আদরের আঁচড়; বদলের ডাক; সকালের পান্তায়
কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজের গন্ধ। ঘাসের শরীরে চাষি
গৃহিণীর আলতার দাগ, নূপুরের শব্দ; রাগ।
তাঁরা আজ বড় নির্বিকার, ব্যস্ততার ছাপ নেই
কোনো — অখণ্ড মৌনতা; কখনও ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডেকে
ওঠে সমস্বরে ছমছমে অন্ধকারে। কেউ আসে
না আপনজন দেখা দিতে একবার, ডাকেও না
নাম ধরে কোনোদিন। সব ঘরে আলো জ্বলে, ওঁরা
থাকে নিজেদের মতো নিকষ আঁধারে; কখনও
জোনাকি প্রদীপ জ্বেলে ছুটে যায় ভর করে
উদাসীন মৃত বাতাসে, চাঁদের আলো কখনও
মায়ার প্রলেপ লাগায় আলোকবর্ষ অপেক্ষায়।

অ ভি জি ৎ ম ণ্ড ল

অপাপবিদ্ধ

অসম্ভব ডানায় সন্ধে লিখতে গিয়ে
দেখেছি কীভাবে পরীদের স্নানঘর
আলো করে আছে জল
স্বচ্ছ, সীমাহীন, সাঁতারের অভিপ্রায়ে
তখন গানের মতো তেষ্টা পায় খুব, ঘুম...

অথচ আঁশটে গন্ধে চারিদিক ছড়িয়ে থাকে
অসার কিছু পালক, রক্তমাখা, চটচটে
সে ব্যথা যতই গভীর হোক, অতল
তবু জলের কাছে জলই তো আশ্রয়

ও য়া জে দ আ লি

রাত্রির উষ্ণতা থেকে

রাত্রির উষ্ণতা থেকে জন্ম নেয় তারার জীবন
রোদ্দুরের উজ্জ্বলতা থেকে
জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা ভাল
হেমন্তের শিশুশীত কচি ধান গাছে
পাখির ঠোঁটের মতো
ঠক ঠক শব্দের বাহার ছড়ায়
দুধেল ধানের শিষে সবুজের মসৃণা মায়া
তাই বড় মনোরম লাগে

রাত্রির আঁধার চিরে জোনাকির নীল নীল
গোপন খেলায়
হৃদয়ের উষ্ণতা ফোটাই

সন্ধ্যার করবী আকাশ তাই যেন
দূরে থেকে উজ্জ্বল হয়

ও য়া হি দা খ ন্দ কা র

ভুলে যাওয়ার আগে

ছবির দেশে ছোটো পাহাড়ের
গায়ে বাসা বাঁধে পিঁপড়ে
মায়ের সাথে শিশুটিও
পাহাড়তলির গান ধরেছে
মাথা ভর্তি অন্ধকার আর
অন্ধকারে নিকষ সন্তান
খোদাইচিত্রের পাশে বেশ মানানসই
দুর্গমতার সাথে ওদের কখনো অমিল হয়নি

তবু ওরা একটা ছবি তৈরি করে,
আলো জ্বালে

আমরা সে আলো থেকে দূরে...
আমাদের মন পুড়ে, চোখ ফুঁড়ে
বেরিয়ে যায় দীর্ঘশ্বাস
মায়াবী নগরে, ফ্রেমগুলি
পাহারা দিতে দিতে প্রহর কাটে।

মনে পড়ে, ভুলে যাচ্ছি না তো শীতল গান।

শ্রী ধ র স র কা র

অনুধাবন

তোমাদের প্রেম আমার পূজা
শ্রান্তি নেই, দুর্বলতা নেই
শুধুই হেঁটে-চলার আনন্দ

তপ্ত বালির স্থির সমুদ্র
শুষ্ক বাতাসের ধারালো প্রবাহ
এক পিপাসার্ত উট, আমি কলম্বাস

পা আছে, প্রত্যয় আছে
একদিন পৌঁছে যাবোই
থামলেই
অন্তহীন অন্ধকার, স্থিরবিন্দু।

স র্বা নী বে গ ম

কবিতার কলঘরে

কবিতার কলঘরে বসে জল তুলি
অবিরত ওঠে কবিতার জলরাশি
ভেজা ভেজা সব, ভেজা চারদিক
অথচ তৃষ্ণা মেটে না—

উপন্যাস

মেকাইল রহমান

কাঙালনামা

নয়

জ্ঞানেন্দ্র সেদিন দামালদের বাড়িতে যাননি। এ নিয়ে আনসার একটু আক্ষেপ করেছিল। দামাল অবশ্য মুখে কিছু বলেনি। বরং দীর্ঘ পনেরো বছর পরে তার কাঙালদাদু ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন, গণরাজপুরে ঘুরে এসেছেন জেনে সে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। মূলত তারই কারণে জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের মনটা ক'দিন ধরে খচ্‌খচ্‌ করছিল। বেরুলেনই যখন অমন করে, তখন কেন তিনি একবার গেলেন না দামালদের কুঁড়ে ঘরে? নিজের চোখেই তো তাঁর দেখার সুযোগ হয়েছিল তাদের অবস্থা!

কিছুতেই আর দেরি করতে পারলেন না তিনি। দামালকে দিয়েই তিনি আবার একবার জরুরি তলব করলেন আনসারকে। ভ্যান নিয়ে চলে এল আনসার। বাড়িতে কারো কোনো কথার জবাব না দিয়ে তিনি সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেন ভ্যানে চড়ে।

একটা মাটির দেওয়াল। তাতে দুটো চাল। দরমা দিয়ে ঘেরা। দম-আটকানো অন্ধকার। একটা তক্তাপোশ পর্যন্ত নেই। মাটির দাওয়ায় রস ওঠে। স্যাঁতসেঁতে। তাতেই পলি পেপার পেতে, চ্যাটা পেতে, কাঁথা পেতে রচিত হয় সুখস্বপ্নের শয্যা।

দামাল পড়ছিল বেড়ার দরজা খুলে দাওয়ার মুখে বসে সূর্যের আলোয়। দাদুকে আসতে দেখে সে আকস্মিক আনন্দে সংকুচিত হয়ে গেল।

ছুটে এসে মহিমা কুশল বিনিময় করে বলল, ও মা কী কপাল আজ! কাঙাল দাদু নিজে এসেছেন। দাদা রে!

জ্ঞানেন্দ্র ভ্যান থেকে অতি সাবধানে নামলেন। দামাল উঠে এসে তাঁর হাত ধরলো।

—হঠাৎ চলে এলেন?

—হ্যাঁ। এলুম আগের দিনের ভুল শোধরাতে।

—কোথায় বসবেন বলুন তো! আসুন আমার ঘরে আসুন।

—নরেন এসে ঘুরে গেল। নিজের চোখে দেখে গেল। এতটা করুণ অবস্থা তা তো

তাঁর অন্তরের ইচ্ছার কথা মেজোবউমাকে বুঝিয়ে বললেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল, কেউ আমরা চিরদিন থাকার জন্যে আসিনি, বউমা। জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত ভোগবিলাসের চাহিদাগুলি ত্যাগ তিতিক্ষার লাগাম দিয়ে বাঁধা। আমরা কিছু নিয়ে আসিনি, কিছু নিয়ে যেতেও পারব না।

আমাকে বলেনি সে। আনসার, এখন তো গ্রামের গরিব-গুরবোও সরকারি ঘর পাচ্ছে। তোমরা পেলে না?

আনসার বলল, লিস্টে নাম আছে বাবু। এবার নাকি দেবে!

– তোর পরীক্ষা কবে, দামাল?

–সামনে ফেব্রুয়ারিতে।

–এসে গেছে তো!

–হুঁ।

–পড়। আমি চলি। মাথাটা ঘুরছে!

দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিতরে চোখ চালিয়ে জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল দেখলেন দামালের কামরায় বইখাতা ছাড়া যেন আর কিছু নেই। এত বইপত্র কোথায় পেল সে? নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতিমান ছাত্রটিকে ভালোবেসে দিয়েছেন তার স্যারেরা।

কী যেন দুরূহ হিসাবের সরল মীমাংসা করে সস্নেহে দামালের পিঠে মৃদু চপেটাঘাত করে ভ্যানে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল।

দামালের মা খোদেজা বলল, আর একটু বসবেন না?

আত্মমগ্ন জ্ঞানেন্দ্র ভ্যানে বসে চোখ থেকে চশমা খুলে ধুতির খুঁটে কাচ মুছলেন, নিরুত্তর।

দামালদের প্রতি অতিরিক্ত দয়ায় ও ধনেন্দ্রর প্রতি সমধিক ক্রোধে বাড়িতে ফিরেই জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল স্থির সিদ্ধান্ত করলেন, মৃত্যুর আগে তিনি দামালের ভূত ভবিষ্যতের একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে যাবেন। প্রথমে তিনি ভাবলেন, দামালকে সপরিবারে তাঁর বিরাট তিনতলা অট্টালিকার নীচের তলায় স্থায়ীভাবে চিরদিন বসবাসের বন্দোবস্ত করে দেবেন। সদর দরজা সংলগ্ন তাঁর নিজের ব্যবহারের যে-দুটি ঘর, তাতেই তারা ঝড়ে বন্যায় নিরাপদে থাকবে। ওই ওদের যৎসামান্য একটি কুঁড়ে ঘর! চারটি প্রাণী ওর মধ্যে থাকে কী করে? দামালের লেখাপড়া আছে। তার একটা পরিবেশ চাই। ঊনপাঁজুরে আনসার সারা জীবনেও ঘরবাড়ি করতে পারবে না।

তাঁর অন্তরের ইচ্ছার কথা মেজোবউমাকে বুঝিয়ে বললেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল, কেউ আমরা চিরদিন থাকার জন্যে আসিনি, বউমা। জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত ভোগবিলাসের চাহিদাগুলি

ত্যাগ তিতিক্ষার লাগাম দিয়ে বাঁধা। আমরা কিছু নিয়ে আসিনি, কিছু নিয়ে যেতেও পারব না। তোমরা সবাই জানো দামাল আমার প্রাণের দোসর। নিজের চোখে ওদের দুঃখ কষ্ট দেখে অন্তরাত্মা আমার কাঁদছে। বউমা, তুমি ধনেন্দ্রকে বুঝিয়ে বলো, সে যেন আমার ইচ্ছায় বাদ না সাধে আর। আমি দামালের নামে উইল করে দিতে চাই আমার দুটি ঘর আর বারান্দার এই অংশ!

জ্ঞানেন্দ্র জানেন তাঁর প্রেমেন্দ্র ও যশেন্দ্র ধনসম্পত্তির ব্যাপারে চিরদিন নির্লিপ্ত উদাসীন। তাঁর স্থির বিশ্বাস বড়ো ও ছোটো দুই ভাই, ওরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই বলবে না। ভয় শুধু ধনেন্দ্রকে নিয়ে। কাউকে কিছু নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। ধনেন্দ্র অর্থের কাঙাল। একথা মেজোবউ-এর অজানা নয়। পঁয়তাল্লিশ বছরের দাম্পত্যে সে পই পই করে শিখিয়েছে, ধনবান হওয়ার একমাত্র উপায় হল নিজের ধন অপরকে একটুও না দিয়ে শুধু পরের ধন আহরণ করা। এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়!

স্বামীর শেখানো এই সুরেই মেজোবউমার অন্তরবীণার তার বাঁধা। শ্বশুর মশাইয়ের কথা সে নাখোশভাবে নাকচ করে দিয়ে জানালো, এমন ধারা সিদ্ধান্ত আপনার মেজো ছেলে যে মানবে না, বাবা!

জ্ঞানেন্দ্র বললেন, তুমি তাকে আমার সাথে দেখা করতে বলো।

মেজোবউ ধনেন্দ্রকে সব বলল ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে। বাবার মনোবাসনার কথা শুনে রুষ্ট ধনেন্দ্র মন্তব্য করল, মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়েছে! ধনেন্দ্র হুকুম হাঁকালো, ওই ছোঁড়াটা যেন আর একদম পাত্তা না পায় এখানে! তল্পিবাহক নফরকে সে নির্দেশ দিলো, দামাল সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ কর!

যারপরনাই উত্তেজিত হয়ে ধনেন্দ্র শেষে তার বাবার কাছে এসে সরাসরি বলল, সংসারের হাল আমি যতক্ষণ ধরে আছি ততক্ষণ আপনার এই সব উদ্ভট ইচ্ছা পূর্ণ হবে না!

ধনেন্দ্রর এই দুঃসাহস দেখে অন্তরে অগ্নিদাহ হল জ্ঞানেন্দ্রর। তিনি ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করে ধনেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি দিলেন, আমি মরিনি এখনো পাষণ্ড! দরকার হলে সংসারের হাল আমি ছিনিয়ে নেবো তোমার হাত থেকে, এটা তুমি ভুলে যেও না!

অবিলম্বে সভা বসল এক সন্ধ্যেরাতে।

জ্ঞানেন্দ্র বললেন, আমরা মহেন্দ্র কাঙালের বংশধর। দয়া আমাদের পরম ধর্ম। ধনেন্দ্র এই সংসারে চরম অধর্ম আরম্ভ করেছে। হয় সে সারুক, নয় সে সরুক! আমার মৃত্যুর আগে আমি ওকে চরম শিক্ষা দিতে চাই।

প্রেমেন্দ্র প্রেম—ভালোবাসার কাঙাল। বাবার নিজের মুখে মৃত্যুর কথা শুনে তার হৃদয়-মন মুহূর্তে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে বলে, পরমেশ্বর আপনাকে পরমায়ু দান করুন! চিরদিন প্রেমানন্দের পরমজ্ঞান দান করে যান আপনি! ধনেন্দ্রর প্রতি আপনার এত ক্রোধের কারণ কী, বাবা?

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল সব জানালেন সবিস্তারে।

বাবার কথা শুনে দামালদের প্রতি দরদে প্রেমেন্দ্রর বিবাগী মন দয়ার্দ্র হল। সে বলল, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, বাবা। মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন আপনি। আপনার শিক্ষাই তো শিরোধার্য, বাবা!

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঔদার্যগুণে প্রীত সন্তুষ্ট হলেন।

অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, কেবল বসতিদান নয়, দামালকে আমি অর্থদানও করতে চাই। এককালীন মোটা অঙ্কের একটা টাকা, অন্তত পাঁচ লক্ষ, আমি দামালের নামে মোকামের ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রূপে জমা করে দেবো। ওর উচ্চ শিক্ষার জন্যে অনেক টাকার দরকার হবে। তখন হয়তো আমি থাকব না। ওই স্থায়ী আমানত ভাঙিয়ে তখন ওর চলে যাবে।

জ্ঞানেন্দ্র ঘোষণান্তে যশেন্দ্রর অভিমত জানতে চাইলেন, বলো, যশেন্দ্র তোমার বক্তব্য কী!

যশেন্দ্র বলল, আপনি তো জানেন, বাবা। যশখ্যাতির কাঙাল আমি। আজ পর্যন্ত জ্ঞানত এমন কোনো কথা আমি বলিনি এবং এমন কোনো কাজ আমি করিনি যাতে আমার পূর্বপুরুষের দুর্নাম হয়। যাতে সুনাম তাতে আমি। আমার বক্তব্য আর ভিন্ন কী হবে? আপনি যা চাইছেন, তাই যেন হয়। দামালের নামে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে দিন। একথা সবাই যখন জানবে, তখন গণরাজপুর ধনরাজপুরের সবাই ধন্য ধন্য করবে। আপনিই কাঙাল পরিবারের পরম পিতা!

যশেন্দ্রর আনুগত্য ও অনাসক্তি জ্ঞানেন্দ্রকে মুগ্ধ করল। তিনি বললেন, আমি আমার অন্তরের ইচ্ছা বিনা বাধায় পূরণ করতে চাই। বাবা প্রেমেন্দ্র ও যশেন্দ্র, তোমরা দু'ভাই তো আমার ইচ্ছার অনুগত! কিন্তু ধনেন্দ্র যে অন্তরায়!

ধনেন্দ্রর কৃপণতা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা নিয়ে সাধারণত কোনো কথা অপুত্রক প্রেমেন্দ্র বলে না। কিন্তু দানশীল পিতার পরার্থব্যাকুলতা দেখে সে বেশ উজ্জীবীত হল। সে বলল, ধনেন্দ্রর স্বভাব ভিন্ন। পরোপকারের কথা সে কোনোদিন ভাবে না। এখানেই তার সাথে আমাদের বড়ো পার্থক্য। আপনি নিজে এবং আমরা দু'ভাই একমত হয়ে যেটা করতে চাইব তাতে তার আপত্তি করা উচিত নয়। এর পরেও আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে যদি সে নির্বোধের মতো অগ্রাহ্য করে তবে তার আপত্তিকেও আমরা গ্রাহ্য করব না। এই পরিবারের যা কিছু ধনসম্পদ, তার চূড়ান্ত মালিক আপনি, বাবা!

জ্ঞানেন্দ্র কনিষ্ঠপুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বলো, যশেন্দ্র?

যশেন্দ্র বলল, দাদা তো ঠিক কথাই বলেছে, বাবা। সংসারের বন্ধনে দাদা জড়াতে চায়নি বলেই তো মেজদার হাতে আপনি সমস্ত বিষয়-আশয় ও সমস্ত ক্ষমতা কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলেন! আমিও তো কোনোদিন কোনোকিছুর হিসাব নিই না। আমি চাই মেজদা

আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে চলুক। আমরা দুজন আপনার বার্তাবাহক আর সে আপনার আজ্ঞাবাহক। শান্তি চাই, বাবা। কারো কারণে এই সংসারে অশান্তি যেন না হয়!

কিন্তু শান্তির সমস্ত কামনা পণ্ড করে দিলো ধনেন্দ্র। সন্ধেরাতে তার বাবা প্রেমেন্দ্র ও যশেন্দ্রর সাথে বসে যা যা সব আলোচনা করেছেন, তার কিছুটা সে শুনল তার স্ত্রীর কাছ থেকে এবং বাকিটা সে শুনে নিলো নফরের কাছ থেকে। সকাল হতে না হতে দারুণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল সে।

–আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না কেন এমন ভীমরতি আপনার চাগালো এই শেষ বয়সে! কী চান আপনি? ভয়ঙ্কর চিৎকারে সারা বাড়ি মাথায় করে তুলল ধনেন্দ্র।

জ্ঞানেন্দ্রও যেন এমন একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতির জন্য তৈরি হয়ে ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, আমি যা চাই, তাই হবে!

আমাদের ধর্ম আলাদা, সম্প্রদায় আলাদা। ওদের ধর্ম আলাদা, সম্প্রদায় আলাদা। সরকার ওদের ফেভারে। ওদের জন্যেই আমাদের পস্তাতে হয়েছে, পস্তাতে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও পস্তাতে হবে। দারুণ পস্তানো পস্তাতে হবে! আপনি কি না ওদের জন্যে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে ফেলছেন, সংসারের শান্তি নষ্ট করে ফেলছেন! দয়াধর্ম, দানধর্ম, মানবধর্ম! আজ আর চলে না ওসব। ওলড্ আইডিয়াজ!

–আমি তা হতে দেবো না!

–ধনেন্দ্র! অত চিৎকার করো না। আমি...

–জানি আপনি এই পরিবারের সমস্ত ধনসম্পত্তির চূড়ান্ত মালিক!

– তা আমি নিজের মুখে কোনোদিন বলিনি। আমি...

– হ্যাঁ, আপনি মহাজ্ঞানী! আপনি ত্রিকালদর্শী! আপনি আত্মত্যাগী!

–তুমি তো জানো আমি...

–হ্যাঁ, আমি জানি আপনি জাত ধর্মের বিভেদ মানেন না। মানব ধর্মই আপনার ধর্ম!

–আলবাৎ তাই!

–কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল আপনি! শুধু আপনি না। আপনার বাকি দুই পুত্রও সম্পূর্ণ ভুল। মিথ্যে কল্পনার জগতে আপনাদের বাস। বাস্তবকে অস্বীকার করতে চান আপনারা। এখানেই আপনাদের সাথে আমার পার্থক্য।

ধনেন্দ্রর হিংস্র বাক্যবাণে বিদ্ধ হলেন জ্ঞানেন্দ্র। তাঁর পৈতৃক এই বিরাট অট্টালিকার মতোই অন্তরে ছিল এক মনগড়া রাজপ্রাসাদ, যার ভিত পর্যন্ত কেঁপে গেল ধনেন্দ্রর বাক্য গোলায়।

নির্দয় নিষ্ঠুরতার সুরে ধনেন্দ্র বলল, আপনার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই আমার জানা আছে। চিরদিন ভাবাবেগে ভেসে যাওয়াই আপনার স্বভাব। কেন আপনি ভুলে যান, যে-সময়ে আপনার পূর্ব পুরুষেরা বাস করে গেছেন, সে সময় আর এ-সময়ে অনেক ফারাক? এখন কে কার কথা ভাবে আর? তাছাড়া দামাল কে? তাদের সাথে আমাদের রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের ধর্ম আলাদা, সম্প্রদায় আলাদা। ওদের ধর্ম আলাদা, সম্প্রদায় আলাদা। সরকার ওদের ফেভারে। ওদের জন্যেই আমাদের পস্তাতে হয়েছে, পস্তাতে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও পস্তাতে হবে। দারুণ পস্তানো পস্তাতে হবে! আপনি কি না ওদের জন্যে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করে ফেলছেন, সংসারের শান্তি নষ্ট করে ফেলছেন! দয়াধর্ম, দানধর্ম, মানবধর্ম! আজ আর চলে না ওসব। ওলড্ আইডিয়াজ!

গর্জে উঠলেন জ্ঞানেন্দ্র, চুপ করো, পাষণ্ড! আর একটা কথা উচ্চারণ করলে তোমার জিব আমি কেটে ফেলবো! কী ভেবেছ তুমি? নিজেকে তুমি কী মনে করো? এই সব কথা বলে আমাকে চমকে দেবে ভেবেছ? ধনমদে মত্ত হয়ে তুমি আর মানুষ নও দেখছি! দামাল ওইটুকু ছেলে। তাকে আমি ভালোবাসি। নিজের নাতির মতোই ভালোবাসি। সে আমার একাকীত্বের উত্তম সঙ্গী। তার মতো ভালো ছেলে আমি দ্বিতীয়টি আর দেখিনি। আর তুমি কি না তার প্রতি ঈর্ষা করে যা মুখে আসছে তাই বলছ। তোমার এতটা অধঃপতন হবে জানলে কবেই আমি তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করতাম নরাধম! বেরিয়ে যাও তুমি, আর একটা কথাও উচ্চারণ করো না মুখে!

উত্তেজনার বশে এক দমে অনেক কথা বলে নিস্তেজ হয়ে পড়লেন জ্ঞানেন্দ্র। আরাম কেদারায় এলিয়ে পড়লেন তিনি।

হৃদযন্ত্র কি স্তব্ধ হবার উপক্রম হল তাঁর?

সারা বাড়ির লোক একঠাঁই হয়ে গেল।

ঘরেতে ঝড় তুলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল ধনেন্দ্র।

মেজোবউ সিঁড়ির ঘরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। ধনেন্দ্র বেরিয়ে যেতেই সে ঘোমটায় মুখ ঢেকে উঠে গেল উপরে। নফর ফুড়ুৎ করে মুখ টেনে নিলো পশ্চিমের কামরায়।

দশ

সুদূর আমেরিকায় বসে বাড়ির সব খবর পাচ্ছিল নরেন্দ্র। দাদুর সঙ্গে বাবার ফাইট চলছে। জ্যাঠা ও কাকা দাদুর শক্তি বাড়াচ্ছে। বাবা প্রাণপণে চেষ্টা করছে সমস্ত ধনসম্পদের দখল অটুট রাখতে। নিজেদের মধ্যে এই মন কষাকষি আর ভালো লাগছে না মায়ের। মা একান্তে বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। বাবা বুঝছে না। বলছে, হিসেব করে না চললে রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়! নফর আড়ি পাততে গিয়ে বারবার ধরা পড়ে যাচ্ছে দাদুর কাছে। সেও ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। ভালো লাগছে না তার উদর পূর্তির আশায় ঢের নির্লজ্জ উমেদারি। এই সব খবর দামাল নিয়ে গিয়ে দেয় শোহন স্যারের মেয়ে শাপলাকে। শাপলাদিদির ডাকে দামাল এখন প্রায়ই যায় মাটিয়ায় শোহন স্যারের বাড়িতে। নরেন্দ্র দূরভাষ যোগে শাপলার মাধ্যমে কত খবর নিচ্ছে আর কত খবর দিচ্ছে প্রতিদিন!

> সবাইকে অবাক করে দিয়ে নরেন্দ্রর মা নিজে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। শাপলার মায়ের হাত জড়িয়ে ধরে সে বলল, এসো বোন। নরেন আমায় সব বলে গেছে। মা হয়ে তো আর ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি না!

এর মধ্যে প্রায় এক মাস হয়ে গেল দামাল আর আসে না তার কাঙাল দাদুর সাথে গল্প করতে। পরীক্ষা চলছে তার।

নিঃসঙ্গ জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল ছটফট করেন একটা মনের মতো মানুষের খোঁজে। তার সাথে দুটো মনের কথা বলে স্বস্তি পেতে চান তিনি।

দাদুর এই কষ্টের কথা অনুমান করে নরেন্দ্র শাপলাকে বলেছে সম্ভব হলে সে যেন একবার এসে দাদুর সাতে একবেলা কাটিয়ে যায়।

শাপলা কথাটা তার বাবাকে জানালে শোহন আলি এর মধ্যে খারাপ কিছু দেখলেন না। এক ছুটির বিকেলে তাঁরা চারজন মিলে সপরিবারে চলে এলেন কাঙাল বাড়িতে।

শোহন আলিকে সপরিবারে দেখে জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের মনের মরা গাঙে জোয়ার এল যেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আবার তিনি ভেসে গেলেন আবেগের ঢেউয়ে। আবার মুখর হলেন তিনি আলাপে গল্পে। বিশেষ করে, শাপলাকে দেখে তাঁর সহসা মনে পড়ে গেল স্বর্গতা সহধর্মিনী শান্তিরানির স্মৃতি। কুড়ি বছর আগে দুরারোগ্য কর্কট রোগে মৃত্যু হয় তাঁর। মত্যু-স্মৃতির নিভৃত অন্ধকারে হঠাৎ জ্বলে উঠল সাক্ষাৎ-জীবনের দীপশিখা।

তিনি আত্মসংবরণ করতে ব্যর্থ হলেন। হাসতে হাসতে বলে ফেললেন, 'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেবো না!'

উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসে সঙ্গত দিয়ে শোহন আলির স্ত্রী সুরাইয়া বলল, আপনি বরং শাপলার সাথে গল্প করুন, জ্যাঠামশাই। আমরা উপরে গিয়ে নরেন্দ্রর মা আর জ্যাঠিমা কাকিমার সাথে কথা বলি। শৌ, তুই তোর দিদির সাথে থাক।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে নরেন্দ্রর মা নিজে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। শাপলার মায়ের হাত জড়িয়ে ধরে সে বলল, এসো বোন। নরেন আমায় সব বলে গেছে। মা হয়ে তো আর ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি না!

মেজোবউয়ের কথার ধরণে এক মুহূর্তের জন্যে শোহন আলি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন বটে, কিন্তু বুঝতে দিলেন না কিছুই। মুহূর্তে আবার স্বাভাবিক হলেন তিনি।

নফর তার খুপরি থেকে বেরিয়ে এসে হ্যাঙলার মতো দেখতে থাকে শাপলাকে। বারান্দা পেরিয়ে একেবারে সে যেন শাপলা ও সৌহার্দ্যের ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায়।

জ্ঞানেন্দ্র বলেন, অমন উলসুচ্ছিস কেন, নফ্‌রা?

নফর বলে, বলছি মেজোকর্তাকে কি একবার খবর দেবো ভাটায় গিয়ে, বাবু?

জ্ঞানেন্দ্র জিজ্ঞেস করেন, কেন? তোর মেজোকর্তার কী কাজ?

নফর সাহসে বুক বেঁধে বলে, খোকাবাবু তো তাঁরই ছেলে! বউমা হলি তো তাঁরই হবে। তাই...

শিশুর মতো নিষ্পাপ হেসে জ্ঞানেন্দ্র বলেন, এতদিনে দেখছি তোর একটু কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে তাহলে!

শাপলা বলে, আমি কিন্তু ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি এবার, দাদু!

অস্বস্তি বোধ করে সৌহার্দ্য।

নফরকে দূরে তাড়িয়ে দিয়ে মনের আনন্দে গল্পে আর হাসি-মসকরায় মাতেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল।

এর মধ্যে কাঙাল বাড়ির বেশ কতগুলি কথা খবর হয়ে গেল। সেই সব খবর ধনরাজপুর ও গণরাজপুরের হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়ালো। প্রথম খবর কী? না, জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের সাথে তাঁর মেজোছেলে ধনেন্দ্রর তুমুল মতবিরোধকে কেন্দ্র করে রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে গেছে কাঙালের তিন ছেলের মধ্যে। কাণ্ডটা এত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, গণরাজপুরের ভাগচাষি গোলাম রব্বানির মেয়ের বিয়ের দায় মেটাতে প্রেমেন্দ্র নগদ পাঁচ হাজার টাকা চায় ধনেন্দ্রর কাছে, আর ধনেন্দ্র টাকা দিতে নারাজ হয়, উল্টে দাঁত খিঁচায় এবং এতে রেগে গিয়ে প্রেমেন্দ্র স্বাভাববিরুদ্ধভাবে চোখ রাঙায়

ধনেন্দ্রকে এবং যশেন্দ্র তার বড়দার পক্ষ নিয়ে মেজদাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় এবং এতেই হদ্দ মাথা গরম করে ধনেন্দ্র ঘর থেকে মুঙ্গেরি বন্দুক বের করে এনে উড়ো দেওড় মারে। বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল বেজায় চটেছেন এই ঘটনায়।

আর মুখে মুখে ফিরছে এই নতুন খবরটি যে, কাঙালবাবা নিজে দায়িত্ব নিয়ে নাতি নরেনের সাথে শোহন মাস্টারের মেয়ে শাপলার বিয়ে দিয়ে তবে মরবেন। বিয়েটা আবার কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা মুসলিম মাওলানা পড়াবে না। বিয়েটা হবে ভারত সরকারের আইন অনুসারে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। অনুষ্ঠান হবে গণরাজপুর ধনরাজপুর হাই স্কুলের মাঠে। নিমন্ত্রিত থাকবে দুই গ্রামের নির্বিশেষ সকল অধিবাসী। নরেন নাকি নিয়ে আসছে কয়েক কোটি টাকা!

দ্বিতীয় খবরটা এই রকম : গণরাজপুরের ভ্যানচালক উনপাঁজুরে আনসারের ছেলে দামালকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন বলে জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল এদের জীবনের দুঃখকষ্ট লাঘব করতে একরোখা জেদ ধরেছেন যে, মৃত্যুর আগে তিনি দামালদের এনে তুলবেন নিজের ঘরে এবং ছেলেটার ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে এক থোকে পাঁচ লক্ষ টাকা মোকামের ব্যাঙ্কে তার নামে স্থায়ী আমানত করে দেবেন তিনি। এতে ধনেন্দ্রর কোনো আপত্তি তিনি শুনবেন না। এক মাস সময় দিয়েছেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা ধনেন্দ্রকে বুঝে দিতে হবে কাঙালের হাতে। তা না হলে, কাঙাল তাঁর বাকি দুই ছেলে ও দুই গ্রামের অনুগামীদের নিয়ে সোনার হুলোর মেছো ঘেরি, ধার বেলিয়ার ইটভাটা, সরলাপাড়ার দড়িকল, মোকামের গুদোমঘর সমস্ত জায়গা থেকে উৎখাত করে দেবেন ধনেন্দ্রকে। রণংদেহি ধনেন্দ্র চব্বিশ ঘণ্টা গুণ্ডামি করে চলেছে। এখন আর মৃত্যুকেও পরোয়া করছে না সে।

এই দুটো বড়ো খবরের লেজ ধরে হাওয়ায় ভাসছে আরো যেসব ছোটো খাটো খুচরো খবর তার মধ্যে প্রধান হল জমিবিলি-সমাচার। এ বছর সোনার হুলোর ঘেরিতে মাছ ধরামারা শেষ হলে, ওই যে ঘেরি শুকিয়ে যাবে, তা শুকিয়েই থাকবে, ওখানে মাছ চাষ আর হবে না, খালের নোনাজল আর ঢুকবে না। সব জমি বিলিবণ্টন করে দেওয়া হবে, যাদের একটুও জমি নেই তাদের মধ্যে। এমন কি গণরাজপুরের যে-ক'জন আজও

পাট্টা পায়নি বলে রাজ্য সড়কের ধারে বস্তি বানিয়ে বাস করছে, তাদের স্থায়ী ঘর তৈরি করার হুকুম দিয়ে দেবেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল তাঁর অট্টালিকা সংলগ্ন ফাঁকা বাস্তুতে। তিনি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন যে, গ্রাম জুড়ে এত জমি তাদের ছিল না আদপে। তাঁরই ঠাকুরদাদা হরেন্দ্র কাঙাল অভাবী চাষাভুসোর জমি যেখানে যা পেয়েছিলেন সব স্বল্প মূল্যে সাফকোবালা লিখে নেন, কিছু অনাদায়ী কর্জের দিনখিলাপি মওকায় জবরদখল করে নেন। এই অন্যায্য ভূ-সম্পত্তি তাঁর পরকালের কাঁটা। বংশপরম্পরায় এই জমি তাঁর হাতে এলেও, এ তাঁর অনধিকার। জীবদ্দশাতেই এই কাঁটা তিনি সাফ করে যাবেন। শুধু প্রাণাধিক পৌত্র নরেন্দ্রর ফিরে আসার অপেক্ষা। বংশের বাতিখানা বিদেশ থেকে ফিরলেই বিতরণ শুরু হয়ে যাবে।

আর মুখে মুখে ফিরছে এই নতুন খবরটি যে, কাঙালবাবা নিজে দায়িত্ব নিয়ে নাতি নরেনের সাথে শোহন মাস্টারের মেয়ে শাপলার বিয়ে দিয়ে তবে মরবেন। বিয়েটা আবার কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা মুসলিম মাওলানা পড়াবে না। বিয়েটা হবে ভারত সরকারের আইন অনুসারে। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। অনুষ্ঠান হবে গণরাজপুর ধনরাজপুর হাই স্কুলের মাঠে। নিমন্ত্রিত থাকবে দুই গ্রামের নির্বিশেষ সকল অধিবাসী। নরেন নাকি নিয়ে আসছে কয়েক কোটি টাকা!

ধনেন্দ্র ঘুম থেকে উঠে ঘেরির আলায় যায়।

সেখানে তার কান ঝালাপালা করে দেয় হাছেম-কাছেম সনাতন-বেন্দাবন আর নুরো চৌদুলিরা।

—ও মেজদা, ঘেরি নাকি উঠে যাবে! জমি নাকি বিলি হয়ে যাচ্ছে! আমরা তবে কোনে যাবো?

আমারগা উপায় তবে কী হবে, আ মেজদা?

ম্যাচের আগুন জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ধনেন্দ্র গর্জে ওঠে, থামবি তোরা? চারিদিক থেকে সবাই মিলে মাথাটা আমার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলি তোরা! কথা আর খুঁজে পাসনে সব বল!

ধমক খেয়ে, তাড়া খেয়ে সুড় সুড় করে যে-যার কাজে যায় আবার ওরা।

আড়তে মাছ চলে গেছে ম্যাক্স গাড়ি করে।

আড়ৎ-মালিক দাদনদার রণজিৎদার সঙ্গে মোবাইল ফোনে দরকারি কথা সব হয়ে গেছে ধনেন্দ্রর। সিগারেটে টান দিতে দিতে নজর ঘুরিয়ে দেখে সে চারিদিক। পুরো দেড়শো বিঘের সোনার হুলো তার পৈতৃক। এক পয়সা খাজনা লাগে না। ঘেরির ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গেছে। কী করে যে ওই আজে বাজে খবরটা ছড়ালো? গরম মাথা ঠাণ্ডা করে ধনেন্দ্র অনেক সহ্যে অনেক ধৈর্যে। তারপর আলা থেকে বেরিয়ে সরু আল

পায়ে হেঁটে পেরিয়ে পাকা রাস্তায় বাঁধা অল্‌টো তে স্টার্ট দিয়ে হুস করে উধাও হয়ে যায় সে।

রাস্তার উপরেই পড়ে সরলাপাড়া। এখানেই ধনেন্দ্রর দড়িকল। পাটের মরশুমে এলাকার সমস্ত পাট সে বাজার থেকে বাজার দরে দালাল দিয়ে কেনায়। বড়ো গোডাউন আছে। সেখানে মজুত করে রাখে। গর মরশুমে দরকার মতো লরি করে পাট আসে হঠাৎগঞ্জ, ফরাসডাঙা ও হালিশহর থেকে। ম্যানেজার জয়দেব সব দেখভাল করে। চোদ্দটা মেশিনে চোদ্দজন মিস্ত্রি আর সত্তর-আশি জন মেয়ে-মরদ মিলে নানা রকমের দড়ি তৈরি করে কলে দিনরাত। মেশিনে দড়ি পাকায় যে চৌদ্দ জন মিস্ত্রী, তারা নীরবে কাজ করে। তাদের মজুরি একটু বেশি। তাই তাদের দাবি-দাওয়া নেই, ক্ষোভ-বিক্ষোভ নেই।

কিন্তু যে সত্তর-আশি জন মেয়ে-মরদ পাট ভেজায়, পাট আঁশায়, তাদের ফুরোন চুক্তি কাজ। সারাদিন কাজ করে তাদের মজুরি হয় যৎসামান্যই। কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারে না। দু-একজন জয়দেব ম্যানেজারকে দু-একবার বলেছে, পয়সা একটু না বাড়ালি আমারগা চলে কী করে, অ জয়দেবদা?

জয়দেব কাহার প্রভুভজা ভৃত্য। সে বলে, বাজার খারাপ। এই যা দেওয়া হচ্ছে, তা শুধু ধনেন্দ্র বাবু বলে দিচ্ছেন। এই রেট কোথায় আর কে দিচ্ছে শুনি!

এই যুক্তিতে শাইদুল-মাইদুল সোরাব-তোরাব আর অনন্ত-রা শান্ত হয়ে যায়।

কিন্তু ওদের মধ্যে উত্তম বাগদি একটু পেছন পাকা গোছের। সে ফোড়ন কাটে, পেরাই তো রেটের কথা বলো তুমি, জয়দেবদা! তা রেট কি আমরা আর পাঁচটা কলে যাচাই করতি যাই? রেট একটানা একটা জায়গায় বাঁধা। বাজারে সমস্ত কিছুর দাম বাড়ে। শুধু কাঙালের এই দড়িকলের কামিনদের রেট বাড়ে না। তুমি নিজে তো একটু দয়া করে বাবুরে একবার বলতি পারো বুঝিয়ে!

জয়দেব মিথ্যে মায়া দেখায়, বলি কি না বলি, তা তোরা কী জানিস? সব কি আর আমার হাতে সোনা? তা এক কাজ কর না। ওই তো বাবু এসে গেছে তুই নিজে সরাসরি দাবি জানা না। যা বলার নিজে মুখে বল বাবুকে!

গাড়ি থেকে নেমে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ধনেন্দ্র মহাজনী হাঁক ছাড়ে, হোই জয়দেব...

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে কাছে আসে ম্যানেজার।

ওখানে কার সাথে কী কথা হচ্ছিল জয়দেবের কাছ থেকে তা সংক্ষেপে শুনে ধনেন্দ্র এক কথায় মুড়ো মেরে দিলো, রেট আর বাড়াতে হবে না। আর কটা দিন সবুর করো সব। এ দড়িকল উঠে যাবে। খেয়ো, তখন সব সুখ করে খেয়ো!

একটা আতঙ্কের আবহ থাকলে, তাতে কাজ হয় ভালো। ধনেন্দ্র এতগুলি কারবারের মালিক। আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করার কায়দা তার জানা আছে।

নফর সকালে ঘেরি থেকে খারায় করে মাছ এনে দেয়। হেঁসেলে মিনুর মা আছে বাছা কোটা করার জন্যে। ভাত-ডাল-মাছ তরিতরকারি সব রান্না করে মিলেঝুলে তিন জায়। কাঙাল বাড়ির অন্দর মহলে শান্তি বিরাজ করে কিন্তু বারো মাস।

প্রেমেন্দ্র ও যশেন্দ্র ভোরে ওঠে। প্রাত-ভ্রমণ করে। স্নান সারে। চায়ের নেশা তাদের নেই। একেবারে জলখাবর খেয়ে বেরিয়ে যায় নটা-সাড়ে নটায়। অক্লান্ত জনসেবার ঢের চাপ থাকলে, কোনো কোনো দিন দুপুরে তাদের খেতে আসাও হয় না, একেবারে সেই রাতে বাড়িতে ফিরে খেয়ে দেয়ে শোয়।

ধনেন্দ্রর ঘুম ভাঙলে চা চাই। বেড টি। চা খেয়ে সে সিগারেট ধরায়। তারপর টয়লেট-ল্যাট্রিন। তামাকের ধোঁয়া পেটে না গেলে তার বাজ্জি হয় না একটুও। সে এরপর কখন কোথায় জলখাবার খায়, আদৌ খায় কি না, তা কেউ জানতে পারে না। মেজোবউয়ের কাছেও সে যথেষ্ট রাশভারী।

তবে রোজকার সেবাআদ্দি দরকার পড়ে জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের। রাতে তাঁর ঘুম ভালো হয় না। ভোরের দিকে জাঁকিয়ে আসে তাঁর ঘুম। নিজের থেকে ঘুম না ভাঙলে কেউ তাঁকে জাগায় না। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে তাঁর আটটা বাজে। যেদিন তাঁর ভোরবেলাতেও ঘুম আর আসে না, সেদিন তিনি সবার আগে বিছানায় উঠে বসে থাকেন। হরিনাম জপেন। ছোটোবউ এসে বাবার বিছানা ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়ে দেয় রোজ। বড়োবউ তাঁর প্রাতঃরাশ এনে বসে থেকে খাইয়ে যায়। দুটি রাধা বল্লভী, ছোলার ডাল, আধসের দুধ, দুটি পাকা কলা ও একটি সন্দেশ। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এ তাঁর বাঁধা। গড়গড়া ছিল একটা। বেলা দশটার দিকে এক ছিলিম তামাক মৌজ করে না সেবন করলে তলপেটটা তার দম মেরে থাকতো। মেটের হাট থেকে আনা বালাখানা তামাক। কিন্তু গত দশ বছর তা বন্ধ। ডাক্তারের কড়া নিষেধ। হার্টের হাল তাঁর খারাপ। ধনেন্দ্রর কারণেই তিনি মেজোবউকে পছন্দ করেন না। তার কোনো সেবা বাবা নেন না। স্নানের আগে তাঁর তেল মাখায় ছোটোবউ। স্নানের পরে কাচা পরিস্কার কাপড় ফতুয়া এনে দেয় বড়োবউ। বাবা নিজেই বস্ত্র পরিধান করতে পারেন। দুপুরে আহারে সাহায্য করে ছোটোবউ-বড়োবউ মিলে। এই হল বাবার বহাল তবিয়ত। তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে রাজত্ব করা বালিয়ার অন্যতম জমিদার মহেন্দ্র কাঙালের সপ্তম পুরুষ, জমিদার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঙাল!

তো মধ্যাহ্নের আহারে বসেছেন বাবা।

উপরে নিজের ঘরের মেঝেয় আসন পেতে খাচ্ছে ধনেন্দ্র।

বাইরের দুই গ্রামের তামাম মানুষের মাথার উপরে জ্বলছে গণগণে সূর্য।

এমন সময়ে হনফন করে পাঁচিলের বাইরে মোটর বাইক রেখে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ভিতরে ঢুকে এসে গলা তুলে হাঁকতে লাগলো ধনেন্দ্রর ইটভাটার ম্যানেজার ঘনশ্যাম।

–মেজোবাবু ও মেজোবাবু তাড়াতাড়ি আসেন। একটু দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

একবাক্যে বাড়ির সব্বাইকে ঘাবড়ে দিলো সে।

খাবার ফেলে থড়মড় হয়ে তার ঘর থেকে ত্বরিতে বেরিয়ে পড়ল নফর।

এঁটো হাতে বারান্দার গ্রিলে মুখ রাখলো ধনেন্দ্র।

তাকে দেখতে পেয়ে ঘনশ্যাম সামান্য ভরসা পেয়ে দ্বিরুক্তি করলো, তাড়াতাড়ি আসুন বাবু। সর্বনাশ! সর্বনাশ!

ভাত ভরা মুখে বাবা জিজ্ঞেস করেন, ও বড়োবউ, অত চেঁচায় কেন ঘনশ্যাম এই ভরা দুপুরে?

বড়োবউ নিস্পৃহ স্বরে বলে, কী হয়তো হয়েছে ওদিকে।

ধনেন্দ্র ধড়ফড় করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল নীচে। মনটা কু গাইলো তার। সে ঘনশ্যাম কে জিজ্ঞেস করে, কী হলো রে হঠাৎ? এই তো ফিরলুম আমি ভাটা থেকে!

ঘনশ্যাম বলল, আমিও তো কিছু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি আগে! ওই শয়তান রবুল ঢালির কারসাজি!

–কী হয়েছে তা বলবি তো!

–রবুল শয়তান ফুস মন্তর দিয়ে আমাদের কুলি-কামিন সব ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সোলাদানায় নিয়ামত হাজির ভাটায়।

–কুশো? কুশো কী বলে?

– সে আর কী বলবে? মাল খেয়েছে তো হদ্দ!

– চল আমি যাচ্ছি!

এই সব কারবারের এইসব ঝক্কি নতুন কিছু না। ধনেন্দ্র এ সবের ভুক্তভোগী। আগাম টাকা দিয়ে খোদ গিয়ে সে ছোটনাগপুর থেকে এনেছে আঠারো জনের দলটা। কুশো তাদের নেতা। তার সাথে কথা বলেই সব মেটে। এর মধ্যে হাত গলিয়ে দিয়েছে চিটিংবাজ রবুল ঢালি। এত বড়ো সাহস তার! সিঁদেল চোর! এক ভাটার থেকে লোক ফুসলে নিয়ে অন্য ভাটায় দিয়ে দালালি করে হারামজাদা!

ধনেন্দ্র তাকে দেখে ছাড়বে। (ক্রমশ)

গল্প

ফজলুল হক

ঈগল

আধাবস্তিটির নামকরণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি পৌর কর্তাব্যক্তিগণ। শহরটির এক প্রান্তে একটি পাড়া ঠিক গ্রামের মতো। পাড়াটি আধা নিষিদ্ধ পল্লীও বটে। গুজব ছড়িয়েছিল করোনা আতিমারিতে মরার ভয় করছে না ওরা। আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যু হার বেড়ে বন্ধ হয়ে যায় গোপন রোজগারের পথ। জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ-প্রতিযোগিতায় সরকারি অনুদান পৌঁছে গেলেও বছর ঘুরতে না ঘুরতে দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ে। পেট নামক আধারস্থলটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখনও গোপনতা বজায় রেখে কিছু কিছু পরিবার পেটের টানে শরীর বেচে সংসার চালালেও পরে বন্ধ হয়ে যায়। পৌরসভার মাতব্বর মিলেমিশে যারা গোপনে পল্লীটিকে নিষিদ্ধ করতে অবিরত সাহায্য করে তারাই আবার মিটিং মিছিল করে প্রতিবাদ জানায়, অনৈতিক কাজ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে চিৎকার করে। তাই পাড়াটির নামকরণ আধুনিক হয়ে ওঠেনি। ঘুগুরি পাড়া নামে চিহ্নিত পাড়াটিকে মানুষ অশ্লীলতা বলে জেনে এসেছে। অথচ পাড়ায় সব পরিবার এমনটা নয়।

বেশ কিছু পরিবারের মতো টুরুং এর পরিবারে মা দিদি কখনও ঐ নিষিদ্ধ কাজটিকে গ্রহণ করেনি, এখনও শত অভাবেও সততা বজায় রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। টুরুং নিজেও কাজটি ঘৃণা করে। তার ভিতরে ভিন্ন এক

মূল্যবোধ, যা এই পাড়ার মানুষজনের সাথে মেলে না। অভিজ্ঞতা থেকে সে বয়সের চেয়ে অধিক শিখেছে, আর নিজস্ব বোধের জন্ম হয়েছে তার ভেতরে।

মুক্তি চায় সে এই পরিবেশ থেকে। পরিচ্ছন্ন অনাবিল একটি পরিবারের স্বপ্ন ভাসে তার চোখের তারায়। পরিবেশ বদলানো যায় এই সত্যে সে বিশ্বাসী। শিক্ষা নিয়ে তার অভিমান আছে। যা তার ভাগ্যে জোটেনি।

পাড়ার সকলে এখন আংশিক সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। তবে ভেবে দেখলে অংকটা মাসের অর্ধেক দিন। তারপর! কীভাবে চলে তা কেবল পাড়ার লোকগুলো জানে। এইভাবে অনেক দিন পর সংক্রমণ কমলে মৃত্যুর সংখ্যাও কমে। লকডাউন শিথিল হয়। তখন শহরের রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করে পৌরসভা।

টুরুং যৌবনে পা দেবার আগেই মহল্লার অন্য পরিবারের ছেলেমেয়েদের মতো শ্রমিকের কাজে যোগ দেয় জীবিকার তাগিদে। তবে সে স্কুলে অনেকটা দৌড় দিয়েও গন্ডি টপকাতে পারেনি। এখন সে দক্ষ কর্মী। রাস্তা মেরামতের কাজ। সে জানে মিক্সচার মেসিনে কেমন করে পিচ, পাথরের সাথে মেশাতে হয়। 'ফাইভ এইট, থিরি ফোর, হাপ ইঞ্চি, রিজকসন,' কত মাপের পাথর। তারপর আছে বালি ভাজা, সেখানেও ক' বালতি গলা পিচ লাগবে তার জানা। আবার মাথায় ঝুড়ি ভর্তি পাথর মেসিনের হাড়িতে ঘাড় ও হাত বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে তার মতো দক্ষ কেউ নেই। তাই তার বেশি কদর। আর আছে তার গতর। কর্মিদের অনেকেই কাজের ফাঁকে বলে ওঠে,শালা সোল মাছের মতো শরীর। আগা গোড়া 'চম্বুক'।

টুরুং ভেবে পায় না শরীরের এত কদর কেন? ভাবে, এই শরীর তার যত নষ্টের বীজ। কী আছে তার শরীরে। হীরে, জহরত? সে নিজেকে নিয়ে কোনোদিন ভাবেনি। মাথার উপরে একটা সামিয়ানা। একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ। বিশ্বাসী। দুজনে হাতে হাত মিলিয়ে সম্মানজনক কাজ।

কাজ খুলেছে। টুরুং ছুটতে ছুটতে যায়। ওইদিকেই যেতে হবে। ওই বটতলা ছাড়া এ পাড়ার ভিন্ন রাস্তা নেই। সেখান থেকে চারপাশে পথ উপপথ ধরে শহরের মূল সড়কে। এই প্রাচীন বটবৃক্ষটি বহু যুগ ধরে প্রাণী ও জীবকুলের আধার। কত রকমের পাখ পাখালি, পোকা মাকড়, বানর কাঠবিড়াল, এই বৃক্ষে আশ্রয় পেয়েছে সাদরে। গোলাকার শাখা প্রশাখার ছায়ায় দল বেঁধে বসে থাকে সব বয়সের মানুষ। বুড়োরা ছায়ানিবিড়ে অতীতকে ডাকে, ছবি আঁকে। বুড়োদের চোখে তন্দ্রা নামে। ফেলে আসা যাপনের স্মৃতিকাতরতায় চোখের জল আটকানো কঠিন হয়ে ওঠে। আবার মাঝ বয়সি অনেকে আছে যাদের ঘরে মেয়েরা অনৈতিক কাজ করে আর তারা এখানে সময় মাপে। খদ্দের পাওনা মিটিয়ে দিলে সেই অর্থ ছিনিয়ে নেয় আইনসম্মত স্বামী। সন্ধ্যায় মদশালে আসর বসে। কোনো রকম নৈতিকতা তাদের স্পর্শ করে না। মহান জীবিকার

সে জানে এদের অভাব শুধু লকডাউনের জন্য তেমনটা নয়। এরা অলস, চিন্তা ভাবনায় প্রাচীন। আর বউদের দিয়ে রোজগার করায়। এদের যাপনচিত্রগুলি একেবারে আলাদা। দৈবের কাছে বেশি প্রত্যাশা করে। উপরে চোখ মেলে তাকায়, যেখানে স্বর্গ আছে বলে কথিত। যখন পুরুষ মানুষ কাজে বাইরে যায় তখন শহরবাসীর অনেকেই তাদের ঘরে আসে। কখনও ফাকা জঙ্গলে পুরুষকে নিয়ে মজা করে। কোনো গ্লানি স্পর্শ করে না।

নামে এ তাদের অচেতন আত্মবলিদান। টুরুং পাড়া থেকে ছুটে আসে। দম নেয় বটতলায়। আজ একটু দেরি হয়েছে, আটটায় হাজিরা। ছুটতে হবে। এবার তাকে ঠিক করে নিতে হবে কোন পথে যাবে। যে পথের দূরত্ব কম সেদিকে যেতে হবে। অনেক অলি গলি পথ। লায়েকদের সিংহবাড়ির রাস্তাটা সোজা। সেটাই ধরবে টুরুং। ফটকে নিয়মিত অভ্যেস মতো পেছন ডাকে, এ টুরুং, একবার ভাল এদিকে।

পেছন ফিরে তাকায় টুরুং, অ তু।

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পা তোলে। হারামীর বাচ্চা কোনো না কোনো বাহানায় তাকে আটকে রাখার চেষ্টা চালাবেই। রোজ। কী মজা পায় সেই জানে। পা চালায় টুরুং।

ফটকে সামনে দাঁড়ায়, তুদের সদ্দারকে বোলে হাজরিতে ঢুকিন দিবি আমাকে। বসে বসে আর ভালো লাগছে না।

টুরুং ধমকে দেয়, কেনে ঘরে বউ র কাছে মরদ ঢুকে নাই? মাগনা পাহারা দিছিস? ভালোই কামাস, তবে কেনে উদিকে ভালবি।

সে জানে এদের অভাব শুধু লকডাউনের জন্য তেমনটা নয়। এরা অলস, চিন্তা ভাবনায় প্রাচীন। আর বউদের দিয়ে রোজগার করায়। এদের যাপনচিত্রগুলি একেবারে আলাদা। দৈবের কাছে বেশি প্রত্যাশা করে। উপরে চোখ মেলে তাকায়, যেখানে স্বর্গ আছে বলে কথিত। যখন পুরুষ মানুষ কাজে বাইরে যায় তখন শহরবাসীর অনেকেই তাদের ঘরে আসে। কখনও ফাকা জঙ্গলে পুরুষকে নিয়ে মজা করে। কোনো গ্লানি স্পর্শ করে না।

ক্লাস নাইন পাশ টুরুং অন্যদের মতো না। তার ভেতরে ভিন্ন এক চেতনা সম্পন্ন মানুষ বিরাজ করে। সেই চেতনায় সে নিজেকে বলে, চল টুরুং দেরি হয়ে গেল। গোটা পৃথিবীর ঘৃণা মিশিয়ে ঠোঁটের জোরে থুথু ছুড়ে দেয় ফটকের মুখ বরাবর।

শুধু যে আর্থিক সমস্যা তা নয়, টুরুং এর জীবনে হাজার সমস্যা। অবাঞ্ছিত ঘটনা ও স্বপ্নের উপদ্রব। অনৈতিক ভাবনাকে জব্দ করার মনের যে দৃঢ়তা লাগে তা প্রায় ক্ষীণ হয়ে তাকে দহন করে। এসবের বাইরে তার জীবন একটা কিছু পেতে চায়। কী পেতে ইচ্ছে করে? জানে না সে। তবে তার মনে সাধ জাগে একদিন না একদিন ঠিক আসবে; কেউ তাকে নিয়ে যাবে রঙিন ডানা মেলে। চারিদিকে ফুলের বাগান, মাঝে সরু পথ। আকাশে ভাসছে সেই ঈগল। যার ডানায় ভর করে সে উড়বে আকাশের শূন্যতায়। খুজে নেবে শূন্যের রহস্য।

নিজের মাথায় ঝাকুনি দেয় দুই হাতে। সাত সকালে স্বপ্ন! পাগল হয়ে যাবে নাকি? টুরুং পা চালায়। সচেতন করে নিজেকে।

শহরের লায়েক পাড়ার সিংহ বাড়ির দরজা অতিক্রম করতে যাবে, অভ্যেস মতো পথ আগলে দাঁড়ায় ও বাড়ির ছোট ছেলে নন্দকিশোর, মনে আছে কী বলেছিলাম? বলো কী ভাবছ?

কী বলব?

আমার কথার উত্তর পেলাম না আজও। কিছু বলো।

কিশোরের মতো মানুষগুলো যাদের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, যারা মেয়ে মানুষ দেখলেই গায়ে হাত দেয়, তারা ধনী, শিক্ষিত হলেও পুরুষ নয়। বড় ঠিকাদার ওর বাবা। কখনো সখনো কাজে যেতে হয়। তাই ছেলেকে সহ্য করতে হয়। তবে এমনটা সম্পূর্ণ সত্য তাও নয় টুরুং সেটা উপলব্ধি করতে পারে। ছেলেটা বিড়ালের মতো পায়ের কাছে নেতিয়ে পড়ে। হাসি পায় তার।

গোটা শরীর জুড়ে কম্পন। পা টলে। মাঝে মধ্যে এইভাবে পথ আগলায়। কথা বলতে বলতে খামচা খামচি করে। কত রকমের স্বপ্ন দেখায়। আজও খুব ভালো মানুষের মতো কাছে আসে, আমি তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধব, বিয়ে করব।

টুরুং এর গলার স্বরে করুণা ঝরে, তার মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকায়, দাদাবাবু কী বলছ গ তুমি! তাই হয় নাকি!

তার বিনয় ও অনুকম্পা বুঝে সাহসী হয়ে ওঠে কিশোর। আর তারপর প্রচলিত মিথ্যাচারের কথাগুলি নিপুণ কৌশলে বলতে থাকে। ঘনিষ্ঠ হয়ে একটু অসতর্ক মুহূর্তে দুই হাতে টুরুং এর বুক খামচে ধরে। যত না যন্ত্রণা তারও অধিক ঘৃণা নিয়ে সে কোনো রকমে ছিটকে পালায়। মানুষটার মিথ্যাচারের সাথে গোটা মানুষটাকে মেলাতে পারে না। সহজ সরল হয়ে সামনে দাঁড়ালে অন্যরকম লাগে।

জোরে পা চালায়। ছিঃ! সে কি লোভনীয় খাবার যে সবাই তাকে ছিঁড়ে খেতে চায়। তার শরীরে আঁচড় কাটে। তার হৃদয় মন বলে কোনো কিছু কি নেই? পাড়ার দু দশটা মেয়ে এসব পছন্দ করে বলে তাকেও সহ্য করতে হবে।

কতদিন ভেবেছে এ পাড়া থেকে পালিয়ে যেতে। অন্য কোথাও একটু আস্তানা! তার মা বাবা বাদ সেধেছে, নারে তা আর হবে না। জায়গাটার দলিল দেখিয়ে পৌরসভার কাছে দরখাস্ত করেছি, লকডাউন উঠে গেলে ঘর করার টাকা পাব। মাথার উপরে ছাদ হবে। দেখছিস না পাড়াতে কত লোকের বাড়ি হল। আমাদেরও হবে।

এসবের মধ্যে যে বিশ্বাস কাজ করে তা তলানিতে ঠেকেছে। সে জানে গতর না থাকলে খেতে পাবে না। সেই গতর ছিঁড়ে খেতে চায়। পুরুষগুলো বাইরে ভদ্রলোক সেজে থাকে। ভেতরে তাদের শরীর হাঙরের খিদের মতো যৌন ক্ষুধাকাতর।

ভেতরের তোলপাড় নিয়ে সে পা ফেলে। কোথায় পা পড়ছে দেখে না। কাজের ঠিকানার কাছাকাছি এসে হোচট খায়।

পেছন থেকে নিমাই তাকে ধরে ফেলে, দেখে চলতে পারো না?

টুরুং এর মুখে কথা ফোটে না। সে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ও আবার কোথা থেকে এল।

নিমাই তাড়া দেয়, কী দেখছো? চলো কাজে লাগবে না। ওই দেখছো তপন মেসিন ইসটার্ট দিচ্ছে।

টুরুং সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগে ওর চোখের দৃষ্টি থাকে নিমাই এর চোখে। হুবহু ছবিতে দেখা ঈগলের চোখ।

এই চোখ এক বছর আগে এক রকম ছিল। আজ অন্য রকম দেখাচ্ছে। না এই দেখার মধ্যে রকম ভেদ বুঝতে পারে না সে। তবে একটা বিষয় সে বুঝেছে; নিমাই তাকে পছন্দ করে। তপনদা বলেছিল, টুরুং একটা কথা বলবো? তুর যা মুখ ডর লাগে।

তপন মানুষটি ভালো। পেটে মুখে একরকম রা। মেয়েদের অসম্মান করে না। টুরুং তাকে বিশ্বেসও করে।

বলো কেনে ডর কীসের? তুমি কি মন্দ কথা বলবে? বলো বলো। মাথায় ঢালাই পাথরের ঝুড়ি কাৎ করে মিক্সচার মেসিনের হাড়িতে ফেলে সোজাসুজি দাঁড়ায় সে।

কী বলবোরে নিমু'ট খেপে যাবে তুর লেগে। মু ফুটে কিছু বলতে লারে, তবে যেদিন মাথায় ঝুড়ি তোলে সেদিন মজা দেখতে পারবি।

কী মজা? বলো না গো।

কৌতূহল বুঝতে পেরে তপন সাহস পায়।

পাথর যখন ফেলে তুর দিকে ভালতে ভালতে ফেলে। গায়েন করে, হাড়িতে পাথরগুলানও তাল দেয় টরাং টরাং।

টরাং! অল্প সময়ের এক টুকরো হিমেল বাতাস বয়ে যায় টুরুং এর শরীর ছুয়ে। ভেতর পর্যন্ত স্পর্শ করে। কে জানে ঐ নামের সাথে কী যাদু মেশানো আছে সে জানে

না। তার ভালো লাগেছিল। কেন লেগেছিল তা সে তখন বুঝতে পারেনি। যোগাড়েরা টুরং টরাং করে রঙ্গ করে।

আজ নিমাই এর চোখ অন্য রকম। যেন প্রতিজ্ঞা করে এসেছে তাকে কিছু বলবেই। তা বলুক না, বলতেই তো বলছি। বাবুর প্যাটে খিদে আর মুখে লাজ।

নিমাইকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তারও যে নেই তা ঠিক নয়। কিন্তু তা সে কোনোদিন প্রকাশ করবে না ভেবেছিল, অথচ প্রতিটি আপত্তিকর অঘটনে তার চোখ ভেসে ওঠে। তার বলতে ইচ্ছে করে, তুমি আমার টরাং। রাজা। আমার ঈগল পাখি। রাজার মতো। মতি, গতি দৃষ্টি দেখছো কখনও? লম্বা চওড়া ডানা, খয়েরি কালো সাদা মেশানো ডোরাকাটা, ডানা ঝলমলে গোল গোল ছাপ। মাথায় রাজার মতো পালকের তাজ। গোল কাচের মারবেলের মতো ঝকঝকে চোখ। ভেতর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। গোটা শরীর চাবুকের মতো। কত তপস্যার ফলে এ ধন দেখতে পাওয়া যায়। তুমি আমার সেই রাজা ঈগল। তবে সে উচ্ছ্বাস তার মনের গভীরে লুকানো। মুখ ফুটে কিছু বলেনি।

কাজের ফাকে ওরা জলখাবার নিয়ে রোজকার মতো বসে একটু মোরামের টিলার উপর। ভাগ করে খাবার খায়। কথার পর কথা বাড়ে। সুযোগ বুঝে নিমিই বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিল, তপনদা বলছিল বিয়'ট করে লিতে।

ওমনি লাফিয়ে ওঠে টুরুং। অভিমান ভরা রুদ্ধ বাতাস নাভিমূল থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে, তপনদা বলছিল, তাহলে তপনদাকেই বিয়েট করব।

টিলা কেঁপে ওঠে তার পায়ের আঘাতে। নিমাই দেখে টুরুং এর গোটা শরীর কাঁপছে। খাবার ফেলে সে টিলাটির শেষপ্রান্তে গিয়ে লাথি মারতে থাকে। রণচন্ডী রূপ। ভালো লাগে। ভেতর ভেতর ভালোবাসার গভীরতা আঁচ করে। নিমাই ছুটে আসে তার কাছে, তাকে কাছে টানে। এই প্রথম তারা এতটা কাছে এল যে দূরত্ব বলে আর কিছু রইল না।

অবশেষে টুরুং শান্ত হয়। আনন্দ উল্লাস বয়ে যায় নিমেষে। মনের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। চারপাশের মানুষ,

গোল কাচের মারবেলের মতো ঝকঝকে চোখ। ভেতর পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। গোটা শরীর চাবুকের মতো। কত তপস্যার ফলে এ ধন দেখতে পাওয়া যায়। তুমি আমার সেই রাজা ঈগল। তবে সে উচ্ছ্বাস তার মনের গভীরে লুকানো। মুখ ফুটে কিছু বলেনি।

পাড়ার পরিবেশে তার জীবন আবর্তিত। ওই নিমাই? অস্বীকার করেও যুদ্ধের মীমাংসা হয় না। সবকিছুই অভিনয় মনে হলেও নিমাইকে অভিনেতা বলে মনে হয়নি। তার প্রস্তাবের মধ্যে সত্য জড়িয়ে রয়েছে। তবুও কীসের অন্তরায়? টুরুং তার প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না।

কাজে মন দেয়। নিমাই এর মুখমণ্ডলে হতাশার ভাব। দূর দিগন্তে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। পৃথিবীর বুকে বংশ বিস্তার ঘটাচ্ছে ছায়ারা।

পরের দিন ছুটির পর দক্ষিণ-পুব মুখী হাওয়া দিচ্ছিল, দূরের গ্রাম বাদামি ও গেরুয়া রঙের ধুলোর মিশেল। টুরুং দেখল তার টরাং এর মুখ ভার। ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে, সে বিয়েতে রাজী নয়। নিজের জীবনে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। ইচ্ছে ছিল একজন শিক্ষিত ছেলেকে বিয়ে করবে। শুধু শিক্ষিত নয়, একজন ভালো মানুষকে বিয়ে করবে যাতে তাদের ছেলে মেয়ে একটি ভালো পরিবেশ পায়। শিক্ষিত হতে পারে। নিমাই ভালো মানুষ। তারপর থেকে সে কম কথা বললেও কোনদিন অন্যের মতো খামচা খামচি করেনি। যদিও সে এসব করার পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছে। টুরুং এর মাথায় পাথরের ঝুড়ি তুলে দেয়ার সময় তার বুক ওর বুকের মৃদু ছোঁয়া পেত। সে একজন দিনমজুর। কিন্তু সে স্বভাবে একজন প্রকৃত মানুষ। টুরুং বারবার এই সত্যটা মেনে নিয়েও বিয়েতে সায় দিতে পারেনি। যুক্তিও খুঁজে পায়নি।

লায়েকদের ছোটবাবুর কথার মধ্যে হয়তো সত্য থাকলেও সে তাকে নিয়ে কোনো কৌতূহল মনের ভেতরে জায়গা দেয়নি। ঐ ধরনের মানুষগুলো যাদের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, যারা মেয়ে মানুষ দেখলেই গায়ে হাত দেয়, তারা ধনী, শিক্ষিত হলেও পুরুষ নয়।

হোচট খেয়ে বুড়ো আঙুলে লেগেছে। নখের গোড়ায় রক্ত। নিমাই তার হাত ধরে টেনে তোলে। ততক্ষণে মেসিন চলছে। হাড়িতে জল দিয়ে ঘুরাচ্ছে তপন। শব্দে বোল উঠছে টুরুং টরাং।

চল টুরুং। দুহাতে নিমাই এর হাত শক্ত করে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। হাতের স্পর্শে তার শরীরে শিহরন জাগে। সময় কাজের সীমানা ছুঁয়েছে। নিমাই ছুটে গিয়ে পোড়া মোবিল ও এক টুকরো কাপড়ে বুড়ো আঙুল বেঁধে দেয়। নিমাই এর হাতের স্পর্শ, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী সে মুহূর্ত। তবুও আজ তার মনে হল জন্ম জন্মান্তরের বন্ধনের সম্পর্ক মর্মমূল স্পর্শ করে গেল। চারপাশে পাহারাদারের কৌতুক দৃষ্টি।

টুরুং দ্রুত কাজে যোগ দেয়। মেসিন চলে। শব্দ কোলাহল ঘড়ির কাঁটার মতো ক্রমগত বাড়তে থাকে। টুরুং এর চোখে অজানা বিস্ময়। স্পর্শ অথবা অনুভূতির কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না।

নিমাই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বিফল হয়ে কেমন গুটিয়ে রেখেছে নিজেকে। অপরাধ

বোধ মনের খুপরিতে জমে। মানুষটা অশিক্ষিত তবুও তার একটা নিজস্বতা টের পায় টুরুং, যা লায়েক পাড়ার ভদ্রলোকেদের নেই।

নিমাই সতর্ক করে, মাথায় ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ ভারী লাগছে না? যাও হাড়িতে ফেলো গে।

চল টুরুং। দুহাতে নিমাই এর হাত শক্ত করে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। হাতের স্পর্শে তার শরীরে শিহরন জাগে। সময় কাজের সীমানা ছুঁয়েছে। নিমাই ছুটে গিয়ে পোড়া মোবিল ও এক টুকরো কাপড়ে বুড়ো আঙুল বেঁধে দেয়। নিমাই এর হাতের স্পর্শ, অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী সে মুহূর্ত। তবুও আজ তার মনে হল জন্ম জন্মান্তরের বন্ধনের সম্পর্ক মর্মমূল স্পর্শ করে গেল। চারপাশে পাহারাদারের কৌতুক দৃষ্টি।

এমন ভুল হয় না। তবে আজ কী হলো তার। পুরুষের উৎকট ভণ্ডামিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে টুরুং। যারা ভালোবাসা ভালোবাসা বলে তাদের চৌদ্দ পুরুষের অনিষ্ট কামনা করেছে। আজ ভিন্ন এক পুরুষের সততা তার সে বিশ্বাস ফিরিয়ে দিচ্ছে।

কাজের গতি বেড়ে গেলে কোলাহল বাড়ে। কথা শোনা যায় না। ইশারায় হাত নাড়ে নিমাই। সে বুঝতে পারে না। কথা বলতে চায়। অনেক কথার পাহাড় জমেছে। শব্দ কোলাহলে চোখে চোখে কী কথা যে হচ্ছে! অস্থিরতা বাড়ছে শুধু। আর এক অপার্থিব মুগ্ধতা জায়গা করে নিচ্ছে ভেতরে ভেতরে। চিনিয়ে দিচ্ছে ওর অন্তরঙ্গ মানবিক রূপকে।

দুপুরে খাবার ছুটি হল। এক ঘণ্টা। পেটের ভিতরে যত কথা সব বলে ফেলবে টুরুং। কোনো আড়াল নয় মুখোমুখি স্পষ্ট করে সত্য কথাটি বলে দেবে তাকে। এরই প্রস্তুতি নিয়ে সে তার দিকে মুখ ফেরাতে গিয়ে দেখতে পেল, মিক্সচার মেসিনের পাশে যে লাঠিটি শক্ত করে বাঁধা থাকে তার মাথায় একটি কাপড় ঝোলানো। আর আশ্চর্য এক রহস্যদৃষ্টিতে টুরুং দেখতে পেল ওই কাপড় একটি ঈগলের রূপ নিচ্ছে। তখন সে আনন্দে দুচোখ ভরে মুগ্ধবিস্ময়ে দেখল তার কল্পনার মতো সত্যি সত্যি একটা ঈগল পাখি। যা সে বহুবার কেলেন্ডারের ছবিতে দেখেছে।

গল্প

মুসা আলি

ভারতবর্ষের ঈশ্বর

বিকেলের তেরচা সূর্য পশ্চিমের আকাশ বেয়ে ঝুপঝুপ করে নীচে নামছে। সে দৃশ্য সত্যি অপূর্ব। সেখ মতলেব তখন অন্য মানসিক তাগিদে মসগুল। কল্পিত বাষ্পের পাহাড় মনের গভীরে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন। গ্রাম ছাড়িয়ে পশ্চিমের রাস্তায় নামতেই মানবেশের সঙ্গে দেখা। তার চকিত প্রশ্ন, এভাবে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছেন?

জানিস তো এই সময় কোথায় যাই।

দু'জনের মধ্যে আর কথা হল না। মানবেশ থ'হয়ে দাঁড়িয়ে। দেখল, মতলেবের চলার গতি দ্রুততর হয়ে উঠেছে। আসলে বাড়ি থেকে বের হতে একটু দেরি করে ফেলেছিলেন, তাই মনের গভীরে এত বেশি ব্যস্ততার সমুদ্র। চলতে চলতে দু'চোখ বাঁকিয়ে আরেকবার পশ্চিমের আকাশটা ভালো করে দেখে নিলেন। রাস্তার পাশে বড়ো অশ্বত্থ গাছের ডালে ডালে শুরু হয়েছে একেবারে অন্তিম বিকেলে নীড়ে ফেরা পাখিদের কলতান কাকলি। মানুষের মতো ইতর প্রাণীও সন্ধের আগে নিজস্ব ডেরায় ফিরতে চায়। তাই কী কলতানের মধ্যে বিহ্বলতার এত গভীর বিস্তার?

চলতে চলতে ভাবতে ভাবতে পথ পার হচ্ছেন মতলেব। মোরাম রাস্তা। মাঝে মাঝে রাস্তার দুপাশে হেলে পড়া বড়ো বড়ো গাছের শাখাপ্রশাখার ছায়ায় মতলেবের দুচোখ থমকে যাচ্ছে। আরেকটু গেলে এলাকার একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়। দিগগজ পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে

দাঁড়িয়ে। জীবন গড়ার তীর্থস্থান। নতুন নতুন মনন আবিষ্কারের নিরিখে সেই সত্য সর্বজন বিদিত। সামনে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। পার হতে পারলেই আর মাত্র সামান্য পথ। মতলেবের কানে ঢাকের মৃদুমন্দ শব্দ ভেসে আসছে। দুদিন আগে দুর্গোৎসব শুরু হয়েছে। সেদিন মহাষ্টমী। গুড় গুড় শব্দে ঢাক বাজছে। কাঁসর বাজাচ্ছে ব্যস্ত ছেলে-ছোকরার দল। পূজা মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে স্বপন সরকার এক পলক ভেবে অস্ফুটে বললেন, তাহলে কী আজ মতলেবদা আসছেন না? আসার হলে তো এতক্ষণ....। নাকি অন্য কারণে আসতে দেরি করছেন? হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, সূর্য ডুবতে বেশি দেরি নেই। চকিত চেতনায় প্রিয় মতলেবদাকে আবার একপলক ভেবে নিলেন। এলাকার মধ্যে তিনিই একনিষ্ঠ ধর্মীয় মানুষ অথচ অন্তরে অন্তরে একেবারেই গোড়ামিশূন্য। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁর ভিতরটা সীমাহীন সমুদ্রের মতোই।

আবার প্রশ্ন জাগল মনে, এখনও আসছেন না কেন? দেখি তো, বলেই মণ্ডপের সীমানা পার হয়ে স্বপন সরকার রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে দেখলেন, লোকটা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন। ঘেমে নেয়ে গিয়েছেন।

বেলবরণের মতো ঘেরা জায়গার পাশে বাঁধানো লাল বেদি। ঠিক তার পাশে সাদামাটা টিনের ছাউনিতে দুর্গা। সেটাই মূল পূজামণ্ডপ। মতলেব লালবেদির সামনে থমকে দাঁড়ালেন। পূজামণ্ডপের সামনে স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে স্বপন সরকার। তাঁকে উদ্দেশ্য করে মতলেবের স্বগত কথা, এট্টু দেরি হয়ে গেল রে।

হতেই পারে।

মতলেবের মুখে মিষ্টি হাসি। দু'জনের সম্পর্ক দাদা-ভাইয়ের। বয়সের কারণে মতলেব বড়ো, তাই সম্পর্কে দাদা, স্বপন তার প্রিয় ছোটো ভাই।

স্বপনের স্বাগতম উক্তি, চটপট সেরে ফেলুন।

দ্রুত অজু সেরে বেদির উপর উঠে বসলেন মতলেব। পশ্চিমমুখো হয়ে। মুহূর্তে মাইকের তর্জনগর্জন থেমে গেল। ঝনর ঝনর কাঁসরঘন্টা আর বাজছে না। ঢাকের বাদ্যিও নীরব হয়ে গেছে। ছেলেপুলেরা ছুটোছুটি বন্ধ করে লাল বেদির চার পাশে স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে। পশ্চিম আকাশে অস্তগামী লাল সূর্য দাদা-ভাইয়ের গভীরতর সুসম্পর্কের প্রধানতম সাক্ষী।

নামাজ সারতে মতলেবের মিনিট পনেরো লাগল। মহাষ্টমীর বেলাশেষে মাগরিবের নামাজ। স্মিত মুখে লাল বেদির সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বপন সরকার। থেমে থেমে বললেন, প্রসাদ নিয়ে যেতে ভুলবেন না মতলেবদা, আজ তো মহাষ্টমী।

মতলেবের মুখে মৃদু হাসি, মনের গভীরে অন্য মাদকতা। উঠে দাঁড়ালেন। দু'জনেই জানেন, বছর বছর এমনি করে চলে আসছে পারস্পরিক ঐতিহ্যের পারম্পর্য, স্মরণীয়

স্মারক ভুলতে না পারার স্মৃতি, একবৃন্তে দুটি কুসুমের কঠোর বাস্তব রূপায়ণ। উপলব্ধির বিস্তার সমান সমান বলেই দুজনের মনের ইজেলে সমতুল্য জলছবির ঘননিবদ্ধ বিস্তার। স্বপনের চাপা প্রশ্ন, ফিরবেন কখন?

একটু পরে, বছর বছর যেমন আসি যাই।

স্বপন মাথা নাড়লেন তালে তালে।

দ্রুত অজু সেরে তার বাপি লাল বেদির উপর উঠে পশ্চিমমুখো হয়ে বসেছিল। আকাশ বেয়ে অস্তমিত সূর্যের লালিমা ধীরে ধীরে লুকিয়ে যাচ্ছে। বাপির নামাজ শুরু হতেই কাঁসর ঘন্টা, ঢাকের বাদ্যি আর মাইকের শব্দ মুহূর্তে থেমে গিয়েছিল। প্রার্থনার মগ্নতা শেষ হতেই স্বপনের বাবা তপন সরকার এসে বলেছিলেন, আসিফদা, আজ মহাষ্টমী, মন্ডপ থেকে ঘুরে তবেই বাড়িতে ফিরবেন।

আরেকটু পরে দুর্গা আর পীরের মাঝে অদৃশ্য সাঁকো তৈরি করে বাড়ির পথে হেঁটে চলেছেন মতলেব। পূজা মণ্ডপের আলো যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, ততদূর চলতে চলতে বার কয়েক পিছন ফিরে তাকালেন। তারপর অন্ধকারে মিশে গেলেন। স্বপন খুশি হয়ে মতলেবের কোঁচড়ে পূজোর ফুলছড়ানো অনেক ফলের কুচি দিয়ে দিয়েছেন, ছেলেটা খুব উদার, কোনো ভেদ মানে না, পরম্পরা রাখতে জানে। বাপকা বেটা হয়ে উঠতে পেরেছে।

মতলেব অন্ধকার পথে চলতে চলতে একটু হাসলেন। ডান হাত দিয়ে কোঁচড় থেকে কয়েকটা ফলের কুচি তুলে নিয়ে খেতে খেতে এগিয়ে চলেছেন, আনমনে ভাবছেন। একটা ঝাপসা অতীত স্মৃতি দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হৃদয়ের পাতায় পাতায়। দুরন্ত অতীতের ধাক্কায় কেমন যেন বেসামাল হয়ে পড়ছেন।

তখন আর বয়স কত হবে, বড়ো জোর দশ/বারো। তার বাপি ঠিক এমনি মহাষ্টমীর দিন সূর্য ডোবার আগে তাকে সরকারদের লাল বেদিতে নিয়ে এসেছিল। সেদিনও একই দৃশ্য দেখেছিল সে। দ্রুত অজু সেরে তার বাপি লাল বেদির উপর উঠে পশ্চিমমুখো হয়ে বসেছিল। আকাশ বেয়ে অস্তমিত সূর্যের লালিমা ধীরে ধীরে লুকিয়ে যাচ্ছে। বাপির নামাজ শুরু হতেই কাঁসর ঘন্টা, ঢাকের বাদ্যি আর মাইকের শব্দ মুহূর্তে থেমে গিয়েছিল। প্রার্থনার মগ্নতা শেষ হতেই স্বপনের বাবা তপন সরকার এসে বলেছিলেন, আসিফদা, আজ মহাষ্টমী, মন্ডপ থেকে ঘুরে তবেই বাড়িতে ফিরবেন।

নতুন করে বলতে হচ্ছে কেন?

না মানে মনে করিয়ে দিলুম, প্রতি বছরের আমন্ত্রণ।

কিশোর মতলেব দেখেছিল তার বাপির মুখে স্মিত হাসি। যেন সেটাই উত্তর। আরও দেখেছিল, লাল বেদির উপর বাপির প্রার্থনায় আত্মমগ্নতার কী গভীর তন্ময়তা। সেদিন প্রথম ভারতীয় সহিষ্ণুতার প্রথম পাঠ নিতে পারলেও মনে মনে কয়েক গন্ডা বিরূপ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল মতলেব। দুই গ্রামের মাঝে না হলেও দুই গ্রাম মিলিয়ে একটাই তো খেলার মাঠ। খেলা ধূলোর প্রয়োজনে অনেকবার তাকে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু সেদিনের অনুভূতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

যাবার আগে মা তাকে পই পই করে বলে দিয়েছিল, তোর বাপকে দিয়ে এতটুকু বিশ্বাস নেই রে। দেখিস খোকা, লোকটার পাল্লায় পড়ে যেন পূজোর জিনিস খেয়ে ফেলিস নে। আল্লা ভগমান এক নয় রে। আমাদের আল্লা, ওদের ভগমান। ওসব খেয়ে ধর্মচ্যুত হতে যাবি কেন? একদম ছুঁবি নে।

বাপিকে এসব বলতে পারো না?

আমার কথা শুনলে তবে তো।

আবছা অন্ধকার পথে চলতে চলতে মায়ের পুরনো কথায় মুখর না হয়ে পারল না মতলেব। মনের অন্ধ গলিপথে তুচ্ছ প্রতিবাদের ঢেউয়ে উদ্বেলিত হতে হতে থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল বাপিকে, তুমি আমাকে পূজোর ফলকুচি খেতে বলছ?

সব কিছু বাজার থেকে কেনা, কোথায় কী অসুবিধা বলবি তো?

বাজারের ফল আর পূজোর ফলকুচি এক হল?

তফাৎ কী দেখলি?

মা আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে বলেছে, কুচিগুলো নিয়ে ওরা তো পূজো করেছে।

ফলকুচিতে পূজো হয় না রে, ভক্তির নৈবেদ্য শেষ হয় অন্তরের ভক্তি নিবেদনে। সেই উপলক্ষকে সার্থক করে তুলতে ফলের কুচি দিয়ে প্রসাদের ডালি সাজানো হয় মানুষে মানুষে মিলনের জন্যে।

তাহলে মা এভাবে নিষেধ করল কেন?

অনেকবার বোঝানের চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। মানবিকতার ধর্মবোধকে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে যা হয়। যত নিষেধ করেছি, ততই গোঁড়ামি বেড়েছে। আমার কথা শুনলে বুঝতে পারবি, আমি ঠিক বলছি, নাকি তোর মা।

কিশোর মতলেবের মধ্যে তখনও বিস্ময়ের ঘোর মন থেকে এতটুকু দূর হয়নি। মায়ের হিসেবের সঙ্গে বাপির যুক্তিগুলো কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সাদা কালোয় মেশানো একটা বিশ্রি অবস্থান।

কী রে, বদ্ধ মাথায় এখনও আমার কথা ঢুকল না? প্রসাদে যে আপেল-কুচি দেখছিস, তা কোথাকার জানিস?

বুঝিয়ে বললে শুনতে পারি।

তেল আর জল এক নয় রে।

তা জানি।

জলের অন্য নাম জীবন, না খেলে জীবন বাঁচানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। দেশে দেশে সেকথা সত্যি, শুধু একই জলের নাম ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, এই যেমন পানি, ওয়াটার, এমনি নানা নামে চিহ্নিত করা হয়।

বেশ বললে তো।

আপেল এসেছে কাশ্মীর থেকে। আমাদের সম্প্রদায়ের লোক গাছগুলো পুঁতেছে, পরিচর্যা দিয়েছে, তাদের হাতেই বড়ো হয়ে উঠেছে। তারাই গাছ থেকে আপেল পেড়ে বাজারে নিয়ে এসেছে। রাজ্যে রাজ্যে তা ঘুরতে ঘুরতে বাংলায়ও এসেছে।

এখানে আপেল হয় না?

এজন্যে মাটির আলাদা বৈশিষ্ট্য লাগে যা কাশ্মীরে আছে।

আপেল চাষের জন্যে তা এত বেশি উপযুক্ত?

ঠিক তাই। বাংলায় যারা দুর্গাপূজা করে, তারা সবাই অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ, তোর মায়ের কথা মেনে নিলে ওরা পূজো-প্রসাদের ডালি থেকে দিব্যি কাশ্মীরি আপেল বাদ দিতে পারত কিন্তু তা হয়েছে কী? তা নিয়েই ভাবতে হবে তোকে।

মা কী এসব জানে না?

কোনোদিন আমার কথা শুনতে চায়নি।

কেন?

ধর্মকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের বিভিন্নতায় কঠোর বিশ্বাসী, ধর্মীয় মানবিক গুণে আস্থা গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু বাপি, পূজোর পরে প্রসাদের আপেলকুচিতে কী আগের মতো স্বাদ থাকে?

পাগল ছেলে কোথাকার। এভাবে ভাবতে নেই রে। আপেল-কুচি খেতে খেতে তোর কী তাই মনে হচ্ছে? অন্তরের অর্ঘ্যকে মানবিক গুণে রাঙিয়ে তুলতে মানুষ মিলেমিশে সেই ফলাহার গ্রহণ করে। সেটাই প্রসাদের জাগতিক মূল্য।

বাংলার পূজো-আয়োজকরা এতটাই উদার?

সেটাই তো বাঙালির পরম্পরা, পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার ঐতিহ্য। আরেকটা কথা জেনে নে। প্রসাদের ডালিতে শুধু আপেল থাকে না, থাকে কুল, কলা, শসা, সাঁকালু। এসব বাংলার মাটিতে ফলে। আমাদের হাতে তৈরি। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কোনো সম্প্রদায়ভেদ নেই। প্রসাদের থালায় এলে কুল কুল থেকে যায়, সাঁকালুর স্বাদ

জানিস খোকা, ধর্ম মানে গুণ, যা সর্বক্ষণ মানুষকে আপন করে নিতে শেখায়। সেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ থাকতেই পারে না। তোকেও এসব রপ্ত করতে হবে। যে লালবেদির উপর বসে নামাজ পড়লুম, ওটাও তো পূজোমন্ডপের অংশ, দেখলি নে, প্রার্থনার শুরুতেই কেমন করে ঝনর ঝনর কাঁসরঘন্টার শব্দ থেমে গেল। শরীর রক্ষার জন্যে মানুষ ফলপাকড় খায়, তার মধ্যে কোনো সম্প্রদায়ভেদ নেই, ধর্মভেদও থাকতে পারে না।

পাল্টায় না, আপেলও আগে যেমন খেতে ছিল, প্রসাদের ডালিতে এলে তার স্বাদগন্ধ একই থাকে।

এসব কথা মাকে বলোনি কেন?

শুনতে চাইলে তবে তো।

তাহলে এখন বলছ?

তোকে বোঝানোর প্রয়োজনে। তাছাড়া তোর মাকে বলে নিজের পথে না আনার গ্লানি আজও ঠিকমতো হজম করতে পারিনে। তুই তো এখনও মায়ের কথা শুনে আমাকে খণ্ডন করতে চাচ্ছিস। জানিস খোকা, ধর্ম মানে গুণ, যা সর্বক্ষণ মানুষকে আপন করে নিতে শেখায়। সেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ থাকতেই পারে না। তোকেও এসব রপ্ত করতে হবে। যে লালবেদির উপর বসে নামাজ পড়লুম, ওটাও তো পূজোমন্ডপের অংশ, দেখলি নে, প্রার্থনার শুরুতেই কেমন করে ঝনর ঝনর কাঁসরঘন্টার শব্দ থেমে গেল। শরীর রক্ষার জন্যে মানুষ ফলপাকড় খায়, তার মধ্যে কোনো সম্প্রদায়ভেদ নেই, ধর্মভেদও থাকতে পারে না। আসলে কাশ্মীরি আপেল বাংলায় এসে পূজোর প্রসাদে মিশে গেছে বাঙালির নিজস্ব সম্প্রীতি রক্ষার আদর্শে, সংহতি রক্ষার মননে। আমাদেরকেও সেই পথে মিলে যেতে হবে।

স্মৃতির সাতকাহণ থেকে ফিরেই পঞ্চাশ উর্ধ্ব মতলেব মনে মনে একটু হাসলেন। যে লোকটির হাত ধরে সেদিন তিনি নিরপেক্ষ ধর্মীয় আদর্শের উদ্বোধন নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, সেই বাপি এখন আর ইহলোকে নেই। বছর দশেক আগে পরলোক গমন করেছেন। কেবল স্বপনের সঙ্গে এখন সেই আদলে তাঁর কাছাকাছি পাশাপাশি অবস্থান। নতুন পুলকের ছোঁয়া মতলেবের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। মন্থর পা চালিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই থুরথুরে মায়ের প্রশ্ন, ফিরতে এত দেরি করলি যে?

ভাবনার তালে তালে পথ চললে সময় বেশি লেগে যায়।

তা বলেছিস ঠিক।

জানো মা, ফেরার পথে বাপির কথা খুব করে মনে পড়ল।

হঠাৎ?

স্বপন কোঁচড়ে অনেক ফলকুচি দিয়েছিল, তা খেতে খেতে মনে পড়ে গেল।

আমিও তোর বাপির কথা ভেবে এখন নিজেকে অনেকখানি পাল্টে নিতে পেরেছি রে। ক'দিন পরে তোর সম্প্রীতির উৎসব। তা নিয়ে স্বপনকে কিছু বললি?

এ বছরের অনুষ্ঠানে স্বপনকে সভাপতিত্ব করার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারলি রে।

এক কথায় হ্যাঁ বলল।

স্বপন এ দায়িত্ব পেলে নিজের অতীতকে আপন করে ভাবতে পারবে। তুইও পারবি নিজস্ব ইচ্ছা পূরণ করতে। ঐতিহ্যের পরম্পরা তো এমনিই। সেজন্যে সহযোগী মানুষের খুব প্রয়োজন।

এত পাল্টে গিয়েছ মা?

লোকটা নেই, এখন তার স্মৃতিতে দুবেলা ভাসতেই হয়।

বলতে বলতে দু'চোখের টলটলে জল আঁচল দিয়ে একবার মুছে নিল। তা মতলেবের নজর এড়িয়ে গেল না। ভাবলেন, বাপির পথ ধরে সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা মায়ের জীবনেও নতুন করে শুরু হয়েছে। একসময় এই মা ...

ভাবগম্ভীর খাদিজার প্রশ্ন, হ্যাঁরে খোকা, স্বপন আমার কথা কিছু বলল?

প্যাকেটে অনেক ফলের কুচি দিয়েছে।

খুব খুশি হল মা।

জানো মা, এ বছর খাবার প্যাকেটে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ আর আমাদের রসুলের বাণী থাকছে।

ছাপা হবে নাকি?

তাই ভেবেছি।

খুব খুশির খবর।

কী কী বাণী, তা জানতে চাইলে না তো?

হ্যান্ডবিলে সেসব থাকছে তো?

কেন থাকবে না?

তাহলে ছেপে এলে দেখতে পাব, চোখে এখন খুব ঝাপসা দেখি রে।

এক সপ্তাহ গেল না, প্রস্তাবিত হ্যান্ডবিল, আমন্ত্রণপত্র আর ছাপা প্যাকেটগুলো মতলেবের বাড়িতে পৌঁছে গেল। বিকেলে হাটবেলায় হ্যান্ডবিলগুলো হাতে হাতে

প্রচার পেল। সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিনব উদ্দীপনা। পরের দিন সকালে এক দঙ্গল ছেলে সম্মতি ছাড়াই স্বপনের বাড়িতে ঢুকল। স্বপনবাবুর বিনীত প্রশ্ন, কিছু বলবে তোমরা?

এত করে বলার পরেও তো আমাদের কথা শুনলেন না।

কী নিয়ে বলতে এসেছ তোমরা?

ওদের অনুষ্ঠানে আপনাকেই সভাপতিত্ব করতে হবে কেন?

সম্প্রীতির অনুষ্ঠান। ওদের আমাদের বলে কোনো কথা হতে পারে না।

মানে কী বলতে চাচ্ছেন?

দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে ফুটবল ম্যাচ যেমন, বিশ্বনবী দিবসে সম্প্রীতির অনুষ্ঠান তেমনি।

আপনি ওদের অনুষ্ঠানে যেতে পারেন না।

কেন তা বলবে তো?

নামাজ আর পুজো এক হল নাকি?

মতলেবদার সম্প্রীতি-অনুষ্ঠানে স্বামীজীর জীবে প্রেম নিয়ে আলোচনা হবে।

স্বামীজী আমাদের।

কিন্তু জীবে প্রেম সকলের।

ভালো করে হ্যান্ডবিলটা পড়ে দেখুন স্যার। কালীভক্ত রামকৃষ্ণের যত মত তত পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ মসজিদে নামাজ পড়েছেন, কালীর বন্দনাও করেছেন। তারপর এমনি উপলব্ধি।

নামাজ আর কালীর বন্দনা এক হল স্যার? তাই আপনাকে নিষেধ করতে এসেছি।

কথাগুলো হুমকি বলে মনে হচ্ছে।

তা ভাবতে পারেন স্যার।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে স্বপনের উক্তি, এভাবে ভাগাভাগি নিয়ে আমার বাড়িতে কথা বলতে এস না।

একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে গ্রামে থাকতে পারবেন না স্যার।

সম্প্রীতির ভাবনা নিয়ে থাকতে পারব তো?

নিরুত্তর দঙ্গলবাজরা গজগজ করতে করতে সরকারবাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। পাণ্ডা প্রবীর শুধু একবার মুখ ঘুরিয়ে বলল, নতুন সময়ের বিড়ম্বনা বড়ো কঠিন স্যার।

হতচকিত স্বপনবাবু দুচোখ বড়ো বড়ো করে চেয়ে থাকলেন প্রস্থানরত যুবকদের দিকে।

সেদিন সন্ধেয় নিরিবিলি স্থানে প্রবীররা আবার সকলে মিলিত হল। নতুন চিন্তার চক্করে প্রত্যেকে একুল-সেকুল। স্বপনবাবু শিক্ষিত মানুষ, স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

শিক্ষকতা করেন, কত অনুষ্ঠানে তাঁর ডাক পড়ে। বলিয়ে কইয়ে হিসেবে বেশ উঁচু দরের। একটা অনুষ্ঠানে না গেলে কী এমন ক্ষতি। ভাবনার গভীর ক্ষতে সকলে কেমন যেন মিলিয়ে যেতে থাকল।

পাণ্ডা প্রবীর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। রবিবারে একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ব না। কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত সময়ের কলকলানি শুধু শুধু গুলতানিতে এগিয়ে চললেও কোনো সমাধানে আসতে পারল না কেউ। সকলে সরে পড়ল মাথার দুর্ভাবনা সঙ্গে নিয়ে।

রবিবার সকাল হলেই প্রবীররা দেখল, আম মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। মতলেবদের বড়ো প্যান্ডেল সাজানোর প্রস্তুতি শেষ। বিশেষ আকর্ষণ সম্প্রীতির উপর স্বপন সরকারের বক্তব্য, তাঁর লেখা যে নাটক মঞ্চস্থ হবে, তা দেখার। প্রবীর আপন মনে খিঁচিয়ে উঠল, লাল বেদি থেকে মতলেবকে টেনে না নামাতে পারি তো আমার নাম—

সন্ধের পরে ফাঁকা মাঠে অন্ধকারে বসে প্রবীররা গুলতানিতে মত্ত। সকলের শারীরিক উত্তেজনায় অভিনব শিহরণের ছলাকলা। মাইকের শব্দ ভেসে আসছে কানে। স্বপন সরকার বক্তব্য রাখছেন। স্বামীজীর জীব-প্রেমের মধ্যে কোনো সম্প্রদায়ভেদ নেই। রামকৃষ্ণের যত মত তত পথ জীবের মুক্তির জন্যেই। তাতে শুধু সাহিত্যতত্ত্ব নেই, মানুষের সাধনতন্ত্রের গূঢ় কথা রয়েছে। নজরুলের একবৃন্তে দুটি কুসুম নিয়েই আমাদের সনাতন ভারত। রবীন্দ্রনাথ সেই সূত্রের ফলশ্রুতি বর্ণনা করে বলেছেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। মতলেবদা'রা রোজ প্রার্থনার সময় 'কাফেরুণ' নামে যে শ্লোক পড়েন, তার মর্মার্থ হল, প্রত্যেকের ধর্ম প্রত্যেকের জন্যে। ১৪০০ বছর আগে মানুষের সার্বিক ধর্মবোধের উপর এ এক যুগান্তর বার্তা।

ষন্ডা প্রবীরের মন্তব্য, পরের বছর দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদকপদ থেকে সরকারকে সরাতেই হবে।

রাত আটটায় নাটক শুরু। প্যান্ডেলের ভিতরে উপচে পড়া ভিড়। ন'টায় নাটকের সমাপ্তি। ফেরার পথে মানুষের ঢল। তাদের মধ্যে টুকরো মন্তব্যের ফুলঝুরি। প্রবীরদের কানে ভেসে আসছে নানা কথা। তানবিরের মন্তব্য, লোকটা বলতে পারেন বটে। সন্ধ্যারানী স্বামীকে শুনিয়ে বলতে বলতে চলেছে, এ্যাই শুনছ, হাবিবের বউ আমাকে দিদি বলে ডাকে। একদিন নেমতন্ন করে খাওয়াবো বলে ভাবছি। অনুষ্ঠানের ভিড়ে খুঁজে পায়নি ক্লাসমেট নন্দিনীকে, ফেরার পথে শবনম তাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে চলেছে। সুচরিতার মন্তব্য, স্বপনবাবুর কথায় মনটা বেশ জুড়িয়ে গেল দেখছি। এ তল্লাটে কেউ আর বিভেদ নিয়ে এগোতে সাহস পাবে না। নেশায় ভরপুর তমাল টলতে টলতে বলতে বলতে চলেছে, মাইরি বলছি, কাল থেকে আমি আর যুবায়ের এক গ্লাসে মাল খাব। ও একবার চুমুক দেবে, আমি একবার।

রাত ন'টা বেজে পনেরো মিনিট। মতলেবের সামনে স্বপন সরকার দাঁড়িয়ে। উৎফুল্ল মতলেবের সাফাই, খুব ভালো বলতে পেরেছ স্বপন। যেভাবে তালে তালে চারদিকে হাততালির ফোয়ারা দেখলুম।

মতলেবদা, এভাবেই জাগিয়ে রাখতে পারলে তবেই তো....।

বড়ো কঠিন সময় স্বপন।

শরতের আকাশে মেঘের আনাগোনা সবসময় সাময়িক।

এক অর্থে তা ঠিক। চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

না, না, সেসবের দরকার নেই।

অন্তত দুগ্রামের মাঝে ফাঁকা জায়গাটুকু।

স্বপনের মুখে গর্বের হাসি।

শ্রী সরকার হাঁটছেন সামনে সামনে, পিছনে মতলেব। সদ্য সমাপ্ত অনুষ্ঠানের দ্যুতি দু'জনের মনোলোক জুড়ে। প্রবীররা এসে পথ আটকে দাঁড়ালো। স্বপনের উদ্দেশ্যে প্রথম কটুক্তি, এ্যাই শুয়োরের বাচ্চা, কী ভেবেছিস তুই?

পাণ্ডা প্রবীরের সরোষ রাসভ মন্তব্য, দ্রুত কাজ সেরে সরে পড়তে হবে রে।

ভয় বিহ্বল মতলেব কিছুটা পিছনে সরে এসে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। কিল চড় লাথির শব্দদোল ভেসে আসছে কানে, যেন মুষলধারায় অবিরাম বৃষ্টি পতন।

সেই কবে বারো ক্লাস উত্তীর্ণ মতলেব ইতিহাস-বীক্ষণে চোখ রেখে তলিয়ে যেতে লাগলেন। দু'চেখের সামনে ভাসছে চিরন্তন ভারতচেতনার ডালি। তুলনার দ্যুতিতে চমকে উঠছেন বার বার। তৈমুর লঙ ভারতের অমূল্য সম্পদ লুণ্ঠন করে বিদেশে পাড়ি দিতে পেরেছিলেন কিন্তু এদেশে জমে ওঠা সম্প্রীতিকে ছুঁতে পারেননি। লঙকে লঙ হয়েই ভারত থেকে ফিরতে হয়েছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজীব সম্প্রদায়ভেদ এবং ধর্মভেদ নিয়ে যে বৃত্ত রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই ছায়া কালের প্রবহমানতায় সম্পূর্ণ মুছে গেছে। ইংরেজশক্তি টানা দু'শো বছরের প্রচেষ্টায় বাঙালির অখণ্ড মননকে দু'ভাগে ভাগ করে দিতে চেয়েছিল। কঠোর বাস্তবে দেশ ভাগ হলেও বাঙালির মনন এপারে ওপারে একই রয়ে গেছে। সনাতন ভারতে মানুষের ঈশ্বর-ভাবনা এমনিই। তাহলে এরা কারা?

ভাবনার গলিপথে মতলেবের শরীর মনে বৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিজ্ঞায় ভীষণ টালমাটাল। শরীর ঝাঁকিয়ে রাসভ স্বরে হেঁকে উঠলেন, কী ভেবেছিস রে তোরা? স্বপন আমার ছোটোভাই। ভারতবর্ষের ঈশ্বরকে তোরা এভাবে? হুই হুই শব্দদোল তুলে হন হন পায়ে সামনের আঁধার ফুঁড়ে এগিয়ে চললেন মতলেব।

একটা অবরুদ্ধ অভাবনীয় সন্ধিক্ষণ। সময়ের অন্ধকার দ্রুত খান খান হতে থাকল।

গল্প

নবনীতা বসু হক

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ রোজ একটু একটু করে জলে ডুবছে। গত ক'বছরে একফুট ডুবেছে। ফলে সরকার একটু চিন্তিত। চিন্তিত বিজ্ঞান দফতরও। কারণ সরকার তাদের ব্যবস্থা নিতে বলেছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ভারতবর্ষকে জল থেকে তোলার জন্য অনেকেই চেষ্টা করছেন।

সরকারি প্রচেষ্টায় প্রথমদিকে অনেক শ্রমিক ও কৃষক মিলে হাজার মাইল লম্বা ক্রেন নিয়ে একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। শ্রম বৃথা; ভারতবর্ষে সেই জলের তলায়। কয়েক ইঞ্চি উঠলেও তেমন কিছুই উন্নতি হল না।

বেসরকারি উদ্যোগ শুরু হল এবার। বিজ্ঞান দফতর বেশ ধমক খাবার পর। অতঃপর ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ঘোরতর ভাবে ধর্মকে আশ্রয় করল। মন্দির-মসজিদে একটাই প্রার্থনা-ভারতবর্ষকে আবার উপরে তোল ঠাকুর।—ভারতবর্ষকে আবার মাথা উঁচু করে বাঁচতে দাও আল্লাহ। তবু কিছু হল না। ইতিমধ্যে ডুবল ভারতবর্ষ আধইঞ্চি আরো। রাজনীতিবিদরা এই নিয়ে নানান পথসভায় বক্তৃতা শুরু করলেন। তবুও কিছুই হল না। যা কে তাই থাকল ভারতবর্ষ।

এল নারীবাহিনী। নানান সংগঠনের সভাপতি বক্তারা পুরুষদের নিন্দা করে মিটিং মিছিল করে ভারতবর্ষকে জল থেকে টেনে তুলতে চাইলেও তারা কিন্তু ভারতবর্ষকে ক্রমেই জলের তলায় ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারল না।

ভারতবর্ষ এদিকে ডুবে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। জলে ডোবা অনেক মানুষ ঘরছাড়া হল। সম্পন্ন মধ্যবিত্তরা আর ধনীরা হিমালয়ের শহরগুলোয় বেশি টাকা দিয়েই জুড়ে বসল। অনেকে বিদেশে চলে গেল। প্রতিদিন সংবাদপত্র, টিভি হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে, একটাই খবর—ভারতবর্ষ জলে ডুবে যাচ্ছে। আজকে ময়নাগুড়ি তো কাল সজনেখালি। আজ বিহার তো কাল রাজস্থান। জলে ডুবে সব ধ্বংস হলেও অনেকেই আবার পুরোনো জায়গা মানে নিজের ভিটে ছেড়ে যেতে চায় না। তাদের নিয়েও হল বিপদ।

ভারতবর্ষকে ডাঙ্গায় তোলা না হলে মাইনে বন্ধ হবে বলে হুমকি গেল বিজ্ঞানসচিবের

বিজ্ঞান দফতর বেশ ধমক খাবার পর। অতঃপর ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ঘোরতর ভাবে ধর্মকে আশ্রয় করল। মন্দির-মসজিদে একটাই প্রার্থনা-ভারতবর্ষকে আবার উপরে তোল ঠাকুর। —ভারতবর্ষকে আবার মাথা উঁচু করে বাঁচতে দাও আল্লাহ। তবু কিছু হল না। ইতিমধ্যে ডুবল ভারতবর্ষ আধইঞ্চি আরো। রাজনীতিবিদরা এই নিয়ে নানান পথসভায় বক্তৃতা শুরু করলেন। তবুও কিছুই হল না।

কাছে। মাথায় হাত দিয়ে অফিসে বসে গভীর চিন্তা নিয়ে ভাবতে বসলেন বিজ্ঞানসচিব। অবশেষে তার মানবের কথা মনে হল।

ভারতের সর্বোচ্চ স্থান হিমালয়ে হিমালয় ইনস্টিটিউট। সেখানে পি.এইচ. ডি করছে মানব আর ঊর্জা। মানবকে ফোন করেছেন বিজ্ঞান সচিব। ঊর্জা কাছেই ছিল।

তিন চারদিন ধরে ভাবল ঊর্জা।

বলল,

আবার শক্তি পরীক্ষা করতে হবে।

কিরকম?

ধর, যারা শ্রমিক শ্রেণি তারা বাংলাদেশের বর্ডার থেকে আসবেন। রাজস্থান থেকে আসবেন ধর্মীয় শ্রেণি। উত্তর দিক মানে হিমালয়ের এদিক থেকে যাবে রাজনৈতিক শ্রেণি। দক্ষিণ ভারত থেকে নারীশ্রেণিরা এক হয়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তবেই ভারতবর্ষকে টেনে তুলতে পারবে।

সবাই জড়ো হবে কিভাবে?

সারা দেশে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এছাড়া রেস্কিউ করে নিয়ে যাওয়া হবে শ্রেণি অনুযায়ী।

মানবের আবার কোন কিছুতেই তর সয় না।

আইডিয়া বলতে দৌড়লো ফোনের দিকে। বিজ্ঞান সচিবের কাছে এক্ষুনি খবরটা বলতেই হবে!

ঊর্জা বলল,

তোর সবেতেই ছটফটানি। ঈশান, নৈঋত কোণের কথা তো বলিনিরে-

ঐ দিকগুলোতে কারা দাঁড়াবে?

ভাবি। তার আগেই তো তুই ফোন করতে ছুটলি! তাছাড়া এত বড় আইডিয়াটা দিলাম তার দক্ষিণা নেই?

চুমু খেয়ে বলল মানব, এমনি কি আর ফোন করতে ছুটেছি বাছা! হিমালয়ের পাদদেশ কয়েকদিনের মধ্যেই ডুববে! নেহাৎ রাণিক্ষেতে বসে আছি তাই! তাছাড়া কত লোক ভেসে আসার খবর আসছে।

তাই তো রে!

বহু লোক মারা গেছে, অনেককে রেসকিউ করতে হচ্ছে! অনেকে আবার নিজের জায়গা ছেড়ে উঁচু জায়গায় আসতে চাইছে না।

২

বসন্ত তুমি কোথায়!

হ। বুড়ির মা। আমি তোমার লগেই আছি। আমাদের খেতি খামার সব ডুবতাছে।

আমাগো ভারতবর্ষের কী হইল!

কি হইল জমিজমার গেট খুইল তাই দেখনের লগে গিয়াছিলাম গো।

আমারে ছাইড়া যাইওনা বসন্ত।

তুমি আমার শেষ বয়সের সঙ্গী! তুমি আমারে ছাইড়া যাইওনা- দেখনা গেঁটেবাত! কোথাও যাইতে পারুম না একা।

তোমারে ছাইড়া কোথায় যাইমু কও দেখি বুড়ির মা। তোমার নাম তো কুহু। কুহু যেদিকে যাবে বসন্ত সেদিক যাবে।

হ্যাঁ গা। কার পাপে ভারতবর্ষ খান এতখান ডুবতাছে!

শ্বাস নেয় কুহু।

তারপর বলে,

কিসের লাইগ্যা?

পাপে বুড়ির মা। এহন কেউ কারুর ভাল চাহে না। সকলেই প্রায় লোভ করতাছে। সেই লোভে সহোদর পাপ আসছে। সেই পাপের গর্ভে ভারতবর্ষ ডুবতাছে! চল ইহান থিইক্যা তো যাওন লাগে!

আমার ক্ষমতা নাই যাওনের! পায়ে ব্যথা।

জলে ভাসাইয়া রাখো নিজেরে। হাঁটবা ক্যান?

তারপর কোথায় যাব? কোন ভারতবর্ষের পাড়ে? কও? বরং ইহানে থিইক্যা মরাটা ভাল।

যাব পাতালে। সেখানে গিয়ে নাগরাজারে জিগাইব ভারতবর্ষরে তোলো। আর জলে ডুবাইও না।

দ্যাখ। কত্ত মনুষ্য ভাসতাছে! খড়ের চাল ভাসতাছে। গরুবাছুর ভাসতাছে।

আবার দেখো বেহুলার মত কলার ভেলায়

কত বউ ভাইস্যা যাইছে! একটা কথা কই তোমায় বসন্ত।

কউ।

তুমি আমারে বারবার সেই শরমের সাথে 'কুহু' বইলা ডাক। প্রেমস্বরে। দ্যাখবে ভারতবর্ষ আবার চাইঙ্গা হইয়া যাইব।

কুহু। অ কুহু। আমি একটা কলার ভেলা পাইসি। বেহুলার মত তুমি শাম্পানে উইঠা বস।

এই লোকটা! বসন্ত জানায়,

কেডা তুমি?

তোমার কোন শ্রেণি গো?

ভেসে যাইবার সময়ও শ্রেণি?

অদ্ভুত হিসেবি মাথা তো ছোকরা!

নাম কি বলবে তো?

বসন্ত খাঁড়া। শ্রেণিটেণি বুঝি না। এর নাম কুহু খাঁড়া। আমরা চাষ করতাম।

তবে চল বাংলাদেশের দিকে।

জলের মধ্যে আবার বাংলাদেশ-ভারত!

বাজে বকবেন না বাংলাদেশ ডোবিনি। বাঁচতে হলে ওদিকে চলুন।

না হে, ছোকরা। তোমার মতলবটা কি!

কুহু বলল,

জলের মধ্যে ভাসসাও তোমার বুদ্ধি কমে নাই। এখন আর মরণ-বাঁচন! যা বলসে শোন না!

মতলবডা ভাল না ছোকরার। আমাগো বাংলাদেশে চালান দিতে চায় বোধহয়। সেই যে দেশ ছাইরা আসছি-তাও ভাসনের সময় সেই দেশে সুযোগ বুইঝা পাঠাইতে চায়।

আরে থাম দেহি। চালান দিলেই এই বুড়ো বয়সে কি ক্ষতি?ভাইসাও তো মরব। বরং তার মতলবটা কী মিষ্টি কথা বলে বুঝে নাও।

মিষ্টি কথা আমার আসে না।

তবে তুমি চুপ কইরা থাকো। আমি কথা কই।

হ হ।

কিসের লগে, আমাগো কোথায় যাইতে কও বাবা?

বাংলাদেশের দিকে।

ক্যান বাবা ওদিকে কি জল কম?

না, ওদিকে খেটেখাওয়া শ্রেণিকে একদিকে রাখা হবে!

কেন বাবা?

তারপর সবাই ওদিকে গিয়েই ভারতবর্ষকে চাঙ্গা করবে।

ওদিকে মানে কোনদিক বাবা?

পুব। যেদিকে সূর্য ওঠে।

দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তরে কারা যাবে?

উত্তর আর পশ্চিম দিকে কারা আছে জানি না। তবে দক্ষিণে আছে নারীরা।

নারী হল বাম। তারে দক্ষিণে রাখা কী ভাল হইল?

অতশত জানি না। পুবে যাবে তো এসো আমার সঙ্গে।

৩

লঞ্চ ভাসছে জলের উপর। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন দলের নেতারা সেখানে। ভাসমান লঞ্চে শুয়ে শুয়ে বামা পদ তরফদার ফিসফিসিয়ে যদুবাবুকে বললেন,

এই যে আমরা লঞ্চে ভাসছি, আমজনতা এতে ক্ষুব্ধ হবে না?

যদুবাবু বললেন,

কে ক্ষুব্ধ হবে? কিভাবে ক্ষুব্ধ হবে? সব তো জলের নিচে।

বামাপদবাবু বললেন,

সব যদি মরে যেত তাহলে বোঝা যেত। সবাই তো আর মরেনি এখনও? ভারতবর্ষের এখনও সবটা ডোবেনি!

মরেনি? কি বলছেন?

এই ভেবেই আপনার রাজনীতিতে উন্নতি হল না। আমরা কোনদিকে যাচ্ছি!

কেন পশ্চিমে?

পশ্চিমই ভাল। আমেরিকার নেটওয়ার্ক কানেকশন ভাল পাওয়া যায়। তাছাড়া ভারতের কোন রাজনৈতিক দলই পশ্চিমের ভোগবাদ মুক্ত নয়। আচ্ছা, হেলিকপ্টারে কারা যাচ্ছে?

প্রত্যেক রাজ্যের শাসিত সরকার।

ওরা পশ্চিমের কোন স্থানে নামবে?

আছে কোন জায়গা।

হুঁ। কিভাবে ভারতবর্ষকে টেনে তোলা হবে?

কিভাবে আর? মুখে বাক্যি আছে-সমস্ত বাক্যি একটা বড় চোঙে ঢোকানো হবে-সেখানকার মিলিত শক্তিই ভারতবর্ষকে জল থেকে ওঠাবে!

তা যা বলেছেন! এখন একটু ঘুমোই। পশ্চিমে পৌঁছে গেলে ডেকে দেবেন যদুবাবু।

আমিও ঘুমোব। লঞ্চ যা আস্তে আস্তে চলছে।

একটু বাদে যদুবাবুকে ঠেলা দিলেন গজপতিবাবু। বললেন,

ওই দেখুন একটা জাহাজ যাচ্ছে!

ওটায় কারা যাচ্ছে?

ওরা পুলিশ আর সামরিক বাহিনী।

ওরা কোন দিকে যাচ্ছে?

লঞ্চ থেকে মাইক করে পুলিশকে বললেন,

কোথায় যাচ্ছো হে ছোকরা?

ঈশান কোণে।

তোমরা কি দিয়ে ভারতবর্ষকে তুলবে?

কেন বন্দুকের গুলি আর ক্ষমতার শাসন।

মিসেস রমা যদুবাবুকে বললেন,

আপনি তৈরি হন।

কেন?

পশ্চিম এসে গেছে।

সেকি! কখন?

বামাপদবাবু বললেন,

আপনি এখানে কেন? আপনার তো দক্ষিণে যাবার কথা!

কেন?

বা! দক্ষিণে যাবে তো নারীবাদীরা। সেরকমই তো নির্দেশ!

আমি নারীবাদী কে বলল! আমি মূলত রাজনীতিবিদ।

সে তো এখন। আপনি তো আগে নারীবাদী দল চালাতেন।

মিসেস রমা জিভ ভ্যাংচালেন। আর মনে মনে বললেন,

এই জন্য শালা তোমাদের কিছু হয় না! নারীকে তোমরা বারবার রাজনীতি থেকে বাদ দিতে চাও। আর তাইতো সংরক্ষণ করার কথা বলতে হয়!

মিসেস রমা আরো বললেন,

জানেন যত ভাগাভাগি করবেন, ভারতবর্ষ তত কিন্তু জলের তলায় চলে যাবে। সুতরাং সাধু সাবধান! আমাকে অছেদ্দা করবেন না। তাতে আমাদের সকলের ক্ষতি। ভারতবর্ষকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে ভাগাভাগি, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, লোভ-ত্যাগ করুন।

বামাপদবাবু আর পারলেন না। বললেন,

রমাদেবি আমেরিকায় আপনার ক'টা বাড়ি! সুইস ব্যাঙ্কে কত টাকা তা কী আর জানি না!

সব মিথ্যা! বিরোধীপার্টির অপপ্রচার। না যদুবাবু না-অত ঝুঁকবেন না- জলে পড়ে যাবেন।

মিসেস রমা তারপর বললেন, ধরলে লম্বা লিস্ট সবারই আছে। আমায় একা দোষী ঠাওরাচ্ছেন কেন?

যদুবাবু বললেন,

ভারতবর্ষের বাড়িগুলো সব জলে ডুবে গেছে। ভাগ্যিস আপনি আমেরিকাতে বাড়ি করে রেখেছিলেন।

চিন্তা নেই ভারতবর্ষ একবার জল থেকে উঠুক। আমি নিজে ওয়াশিংটনে আপনাকে জমি কিনিয়ে দোব। দারুণ প্লটের দালাল জানা আছে আমার!

৪

ও নাওয়ের মাঝি রে কার লাগে তুই ভাসাইলি নাও?

নৌকার মাঝি বললেন,

কে গান গায়?

হিন্দু মন্দিরের পুরোহিত বললেন,

হয়তো কোন ধার্মিক?

এখনো তোমরা ধর্ম নিয়ে বিভেদ করছো। ও হিন্দুও না, মুসলমানও না। ও শিল্পী।

শিল্পীর যদিও জাত হয় না, তবু ও মুসলমান। ওর নৌকাটা থেকে অন্তত একশো মিটার দূরত্ব করে নাও। আমার কাছে নারায়ণ আছে- শালগ্রাম শিলা।

না। যে গাইছে সে ঐ নৌকাতে বসে আছে। ওই দেখেন, দাড়িওয়ালা একটা লোক। ওর গানের গলাটা খুব মিষ্টি। না!

তা ভাল। তবে বেটা মুসলমান। দাড়িওয়ালা।

একটু দূরে রাখো আমাদের নৌকা।

মাঝি বললেন,

এখনো তোমরা ধর্ম নিয়ে বিভেদ করছো। ও হিন্দুও না, মুসলমানও না। ও শিল্পী।

শিল্পীর যদিও জাত হয় না, তবু ও মুসলমান। ওর নৌকাটা থেকে অন্তত একশো মিটার দূরত্ব করে নাও। আমার কাছে নারায়ণ আছে- শালগ্রাম শিলা। বারবার বলেছি

আবারো বলছি- সব ভেসে গেল যখন মধ্যমগ্রামে, একমাত্র শালগ্রাম শিলা নিয়েই আমি গাছে উঠে বসলাম। কতদিন যে এরকমভাবে থাকলাম তার ঠিক নেই। তারপর উদ্ধার করল মিলিটারিরা। রাখল, হিমালয়ে। বউছেলেমেয়ে কোথায় যে ভেসে গেল! এখন বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না।

কিন্তু ঠাকুরমশাই ধর্ম নিয়ে বিভেদ করলে ভারত কী জল থেকে উঠবে?

আমি অতশত জানি না বাপু। সরকার এক জায়গায় যেতে বলেছে তাই যাচ্ছি। না উঠলে না উঠবে! আমার জীবন তো শেষ হয়েই গেছে!

না ভাবলে চলবে কেন! ভারতবর্ষ যদি জল থেকে না উঠে, তাহলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের কী হবে সে কথা ভাবছেন না!

আমার কথা ভারতবর্ষ ভেবেছিল? যখন সব ডুবে গেল! আমার পরিবার ভেসে গেল যে!

ভেবেছে বলেই তো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নেপাল সীমান্তে আপনাকে বাঁচাতে চেয়ে।

আমার বাঁচলেই বাকি বা কী, মরলেই বা কী!

তবু বেঁচে আছেন জীবন ভালোবেসে। আরো যাতে লোক বাঁচে তার জন্য সমবেত হোন। মনে পাপ রাখবেন না।

ওই নৌকাটায় একজন পাদ্রী সাহেব যাচ্ছে-দ্যাখো।

মাঝি দেখে বললেন,

হ্যাঁ ওতে যাচ্ছেন খ্রিস্টান একজন পাদ্রী সাহেব। কেরালা থেকে আসছেন।

তুমি জানলে কি করে?

নৌকাটায় লেখা আছে।

চল তো ওর একটু কাছে নিয়ে - আলাপ করি।

আপনার কাছে শালগ্রাম শিলা আছে না?

পাদ্রীর পাশে থাকলে কিছু হবে না। ওরা আমাদের দেশের কত উন্নতি করেছে।

ও যত দোষ মুসলমানের? তাদের নৌকার কাছে গেলেই শালগ্রাম শিলা নষ্ট হয়ে যাবে?

মুসলমানরা গরু খায়।

আর পাদ্রীরা বুঝি খায় না?

ওরা সাহেবের জাত। ওরা গরু খেলেও পাপ হয় না!

শ্লা-

স্বগতোক্তি মাঝির মুখে। সে জোরে বলে,

দাদা গান কেন থামালে? গাও।

দাড়িওলা গায়ক
গাইতে শুরু করলো-
কোনখানে যাস ওরে মাঝি কোনখানেতে,/
তোর যেখানে জমি আছে তার টানেতে।
নাওয়ের মাঝিরা 'হেঁইয়ো রে, হেঁইয়ো"- বলে
—জোরে জোরে
আরো জোরে—নৌকা চালায়। আর সেই টানে একতার জয়ের ভয়ে সজোরে চেপে রাখে পুরোহিত তার শালগ্রাম শিলাকে!

৫

ছোট্ট ছোট্ট পানসি তরী। সেখানে ভেসে যাচ্ছে সুবেশা নারীর দল। দল বেঁধে যাচ্ছে কন্যাকুমারীর দিকে। তারা অবশ্যই সকলে বিবাহিত নয়; কন্যাকুমারীর মত এক পুরুষের জন্য অপেক্ষারত থাকতে তাদের বয়ে গেছে! মিস নর্তকী, মিস রূপসা, মিসেস মাথানি, মিসেস সিংহানিয়া নারীবাদী সংগঠনের নেত্রীরা শুরু করেছেন পুরুষের নিন্দে!

পুরুষরা আমাদের দক্ষিণে ঠেলে দিল!
মিস নর্তকীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিস রূপসা বললেন,
তা যা বলেছ!
মিসেস মাথানি বলল,
ওদের সম্বরের মধ্যে সেদ্ধ করা উচিত!
মিসেস সিংহানিয়া-
ওদের জন্য ভারতবর্ষ পাতালে মুখ লুকিয়েছে!
ওদের এই মনোভাব না বদলালে- বলে দিলাম, ভারতবর্ষকে টেনে তোলা যাবে না!
মিসেস সিংহানিয়া বিবাহিত। তাকে ঠেস দিয়ে মিস রূপসা বললেন,
পুরুষ ছাড়া আমাদের আবার চলে না। ওদের বিয়ে করে,
ওদের মা হয়েও হয়নি; সেই সন্তান পালন করে যেতে হচ্ছে।
মিস নর্তকী বললেন,
এমন ভাব দেখায় যেন নারীরা কোন কর্মের নয়, অথচ ভারত সরকারকে বলে দক্ষিণে আমাদের পাঠালো। যেহেতু দক্ষিণে জল বেশি।
মিস রূপসার একটা পার্লার আছে। সেটা এখন জলের তলায়। কিন্তু ব্যাগে ছিল লিপস্টিক। ঘসতে ঘসতে বলল,
রাতদিন ঝগড়া করে ছেলেগুলো ভারতবর্ষকে জলের তলায় পাঠিয়েছে।

মিসেস সিংহানিয়া বললেন,

ওরা বিশ্বাস করে, নাচ বিয়ের পর আর করা যায় না। কত কষ্ট করে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম এদ্দিন!

মাথানি বললেন,

আর কোথায় বেঁচে থাকা? পুরুষের জন্য এবার সবাই ডুববো। এক মাসে ভারতবর্ষ একফুট ডুবেছে!

নর্তকী বললেন ঠোঁট উল্টে,

মোটেই না! ভরসা রাখি আমাদের জন্যই ভারতবর্ষ জল থেকে উঠবে!

পানসি করে আসছিল নারী উপজাতির দল। তারা আপন মনে গান গাইছে। মিসেস মাথানি বললেন,

এই তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

কেন দক্ষিনে?

কেন!!

সরকার বলেছে।

তোরা কোন নারী সংগঠন?

আমাদের কোনও সংগঠন ফংগঠন নাই। সরকার থেকে বইলল তাই চইলে এলাম।

মিসেস মাথানি ঠোঁট বেঁকিয়ে ইংরেজিতে তিন সঙ্গীকে বললেন,

এই ছোটলোকগুলো এখন দক্ষিণে যাবে!

মিসেস সিংহানিয়া বললেন,

এই তোমরা ফিরে যাও। তোমরা দক্ষিণে গেলে ভারতবর্ষ আরো জলের তলায় ডুববে!

আমরা ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা। তোদের মত বিজাতীয় নয়, আমরা না গেলে হবেক নাই। তাইতো সরকার বললেক—

মিস নর্তকী বললেন,

দ্যাখো একে পুরুষগুলো তারপর,

এই ছোটলোকগুলো মিলে ভারতবর্ষকে একেবারে জলের তলায় পাঠিয়ে দিচ্ছে! এক্ষুনি উপায় বার কর।

মিস রূপসা বললেন,

যেতে দাও। কাজ ঠিক আদায় করে নেব!

কিভাবে?

ওদের দিয়েই নারীশক্তি প্রয়োগ করাব। ওরা থাকবে সামনে। আর আমরা পেছনে। ওরাই ভারতবর্ষকে ঠেলবে!

অগত্যা!

বাকি তিনজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল!

৬

ঊর্জা, একমাস হয়ে গেল, ভারতবর্ষ আরো ডুবলো। ওঠার তেমন কোনো লক্ষণ নেই!

তাই তো মানব! কি করা যায়?

এত নির্দেশ দিলাম—তবু দলে দলে ঝগড়া। ধর্মে-ধর্মে লড়াই, মধ্যবিত্ত আর আদিবাসী নারীতে কোন্দল করে যাচ্ছে। এদিকে ভারতবর্ষে এক মাসে আরো ছ'ইঞ্চি ডুবেছে।

কি করা যায়?

আইডিয়া!

যদি আকাশবাণী করা যায়! একটা হেঁড়ে গলায় নির্দেশ দেওয়া যায় উপগ্রহ থেকে!

যেমন!

তোমরা দক্ষিণ, পূর্বে, ঈশান, নৈঋতে, পশ্চিমে উত্তরে, অগ্নি ও বায়ুর দিক থেকে আকাশবাণীর মত চোঙে বলবে। আর তার সঙ্গে লেজারে দেবতার ছবি দেখাবে!

আকাশজোড়া চিত্রদর্শন! ব্যাপারটা বেশ শক্ত যদিও।

তবু করতে হবে একজোট। না হলে ভারতবর্ষের শক্তি একজোট হবে না। আর একজোট নাহলে ভারতবর্ষ যে ডুববে মানব।

সৈয়দ রেজাউল করিম

ফুল ছোঁয়ানি মেয়ে

তখনো ফিঁকে আঁধার। ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়েনি ধরণীর বুকে। কলকাকলিতে ভরে ওঠেনি পৃথিবীটা। বিছানা ছেড়ে ওঠেনি অধিকাংশ মানুষজন। অনেকে তখনো সুখ-স্বপ্নে বিভোর। চোরের মত বিড়াল পায়ে সুজাতা গিয়ে হাজির হল নয়নতারার বাড়িতে। দরজার শিকল ধরে বেশ কয়েকবার নাড়াল। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেল না। বাধ্য হয়ে উঁচু গলায় সুজাতা ডাকল—তারা! এই তারা!!

সেই ডাক সহজেই পৌঁছে গেল তারার কানে। চটকে গেল তারার ঘুম। অস্ফুট স্বরে সে শুধালো—কে সুজাতা দি?

—হ্যাঁ রে মুখপুড়ি! আমি ছাড়া আর কে আছে তোকে ডাকার?

বিছানা ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠল নয়নতারা। ঘরের হাল্কা অন্ধকার হাতড়ে দরজাটা খুলে দিল। সুজাতা ঘরে ঢুকলো। নয়নতারা কোন রকমে মুখে হাতে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তার সাথে।

সুজাতা বামুন ঘরের মেয়ে। লেখাপড়া জানে। ছোট দুটো মেয়ে আছে তার। বেজাতের একটা ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল সে। তার খেসারত সুদে-আসলে দিতে হয়েছে তাকে। অকালে হারাতে হয়েছে স্বামীকে। মান-সম্মানের পরাকাষ্ঠে বলি দিতে হয়েছে তার জীবন।

আর নয়নতারার বিয়ে হয়েছিল বিহারী এক ছেলের সঙ্গে। নাম নয়ন। কিন্তু সাত দিন বাদে নয়নহারা হল নয়নতারা। বউ ছেড়ে সেই যে পালাল, আর তার হদিস নেই। সে আজ বছর পাঁচেক আগের কথা। কেউ বলে মেয়ে পছন্দ

আগে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়াত মৌমাছিরা। ফুলের পরাগ রেণু আদান প্রদান করত প্রজাপতিরা। তাতেই ফলে ফুলে ভরে উঠত বাগান। কিন্তু এখন তারা আর সে কাজ করে না। প্রাণের ভয়ে ফুলের উপর গিয়ে বসে না। কারণ ভালো ফলনের আশায় চাষীরা ছড়িয়ে রেখেছে বিষ। সেই বিষের কবলে মারা গেছে অনেক প্রজাপতি, অনেক মৌমাছি। অগত্যায় ভালো ফলনের জন্য বিকল্প পথ বেছে নিয়েছে চাষীরা। প্রজননের কাজটা করিয়ে নিচ্ছে ফুল ছোঁয়ানি মেয়েদের দিয়ে।

হয়নি, তাই জামাই পালিয়েছে। কেউ বলে পথে ঘাটে কোথাও মরেছে। তার যে খোঁজ খবর নেবে সে উপায় নেই। ঠিকানা নেই তার বাড়ি ঘরের। সে মরুক হাজুক তা নিয়ে আর চিন্তা করে না নয়নতারা। তার ভাবনা একটাই। যাবার আগে যদি একটা নিশান ছেড়ে যেত, তাকে নিয়ে কেটে যেত তার জীবন। তার সময়। একাকিত্বের দহনে পুড়ে অন্তত মরতে হত না তাকে। সন্তানকে কোলে নিয়ে কেটে যেত তার দিন। মনের মধ্যে সাধ থাকলেও এখন কিছু উপায় নেই তার হাতে। এখন পেটের দায়ে পরের দুয়ারে কাজ করে বেড়াতে হয়। লোকে এখন তাদের নামে চেনে না, চেনে ফুল ছোঁয়ানি মেয়ে বলে।

ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুজনে পৌঁছে গেল মিত্রদের পটল খেতে। মিত্রদের বিরাট বড় পটল খেত। এপার থেকে ওপারটা দেখা যায় বটে, তবে মানুষ চেনা দায়। তাদের মতো দশ বারোজন মেয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিল। অধিকাংশ বিধবা। পেটের দায়ে বাধ্য হয়েছে মাঠে নামতে। মালতিদি সকলের হাতে একটা করে বালতি ধরিয়ে দেয়। পরাগ মেশানো জলের বালতি। বুঝিয়ে দেয় খেতের কোন লাইনগুলো কে দেখবে। ফুলের রেণুতে পরাগের জল ছোঁয়াবে। কিন্তু প্রশ্ন হল কেন এই পরাগের জল? সেকথা আম আদমি না জানলেও জানে ফুল ছোঁয়ানি মেয়েরা। আর জানে চাষীবাসীরা। জমির মালিকরা।

আগে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়াত মৌমাছিরা। ফুলের পরাগ রেণু আদান প্রদান করত প্রজাপতিরা। তাতেই ফলে ফুলে ভরে উঠত বাগান। কিন্তু এখন তারা আর সে কাজ করে না। প্রাণের ভয়ে ফুলের উপর গিয়ে বসে না। কারণ ভালো ফলনের আশায় চাষীরা ছড়িয়ে রেখেছে বিষ। সেই বিষের কবলে মারা গেছে অনেক প্রজাপতি,

অনেক মৌমাছি। অগত্যায় ভালো ফলনের জন্য বিকল্প পথ বেছে নিয়েছে চাষীরা। প্রজননের কাজটা করিয়ে নিচ্ছে ফুল ছোঁয়ানি মেয়েদের দিয়ে।

টাকা বাঁচানোর জন্য অনেক চাষী আবার অন্য পথ অবলম্বন করে। তারা একটা দুটো কাজের মেয়ে লাগিয়ে বাগান থেকে তুলিয়ে নেয় পটলের সব পুরুষ ফুলগুলো। সেগুলো জলে মিশিয়ে স্প্রে করে দেয় সারা বাগানে। তাতে সময় বাঁচে, শ্রমও বাঁচে। এতে মালিকের ফায়দা হয়, কাজ হারায় ফুল ছোঁয়ানি মেয়েরা।

কাজ করতে করতে আজীব এক ভাবনা এসে জড় হয় নয়নতারার মাথায়। এই বিচিত্র দুনিয়ায় কত কিছু না ঘটে। যা ঘটে না, তাও বুদ্ধি করে মানুষে ঘটায়। মানুষ বুদ্ধি করে.....।

বেহালার ছেঁড়া তারের মত তারার ভাবনাটা হঠাৎ থমকে যায় সুজাতার কথায়।

—এত কি ভাবছিসরে নয়ন?

—ভাবছিলাম একটা ছেলের কথা। যদি একটা পেটের ছেলে থাকত.....নয়নতারা মনের কথা বান্ধবীকে বলে ফেলল অকপটে।

সুজাতা বলল—এতে এত ভাবার কি আছে? একটা বিয়ে করে ফেল জলদি। তোর সব আশা পূরণ হয়ে যাবে। ভালো একটা ছেলে আমার হাতে আছে। বলিস যদি....।

—না সুজাতাদি ! বিয়ে আর করবো না। তাছাড়া মরদটা তো আর মরে যায়নি। আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও সংসার পেতেছে। আবার কোনদিন তাকে ছেড়ে চলে আসবে। আর এসে দাবী করে বসবে, কোথায় গেল আমার বাঁদিটা? তখন কোথায় মুখ লুকাবো আমি? কি জবাব দেব সেই প্রশ্নের ?

—তাহলে বরের অপেক্ষায় বসে দিন গোন, কবে বর আসবে? সন্তান ভাগ্য আর তোর কপালে নেই।

—কেন দিদি? ফুলের জল ছোঁয়ালে পটল হয়, বাঁজা মেয়ের ছেলে হয়, ওষুধ খেলে আমার সন্তান হবে না কেন?

নয়নতারার কথা শুনে সে হাসবে না কাঁদবে, নাকি তাকে দুটো কথা শুনিয়ে দেবে, কিছুই ভেবে উঠতে পারল না সুজাতা। স্বল্প শিক্ষিত নয়নতারাকে কি করে বোঝাবে... ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সুজাতার মনে পড়ে গেল ফটিকের কথা। বাগদার অঁজ পাড়া-গাঁয়ে তার বাড়ি। পেটে লেখাপড়ার ছিটে ফোটা নেই। কিন্তু পোশাক-আশাকে একেবারে লাটসাহেবি চাল। এক নাম্বার ফোড়ে। কোলকাতার মত জ্ঞানিগুনী জায়গায় কথা বেচে খায়। তবে অনেকে বলে ও আসলে মেয়ে বেচে খায়। মেয়েদের দিয়ে ধান্ধা করে বেড়ায়। তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল লাখ টাকা অগ্রিম দেবে, শুধু ১০ মাস একটা শিশুকে পেটের ভিতরে লালন-পালন করে দিতে হবে। ছেলে হলে আরো লাখ টাকা দেবে। একথা শুনে এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল সে। অভাবের সংসারে একটু সুখের মুখ দেখবে বলে। তখন বরটা বেঁচে ছিল। কিন্তু কোনমতেই রাজি হয়নি বর। টাকার চেয়ে

সম্মানটা নাকি তার কাছে অনেক বড়। কিন্তু সে সম্মান কোথায় যায়, বউকে পরের বাড়িতে কাজে পাঠাবার সময়? কথাটা বলবে বলবে ভেবেও সেদিন বলতে পারেনি সুজাতা। কারণ সংসারটা দুজনের, একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সুজাতা। সেই লাখ টাকা তার কপালে না জুটুক, এখন সেই টাকাটা নয়নতারা পেলে দোষ কোথায়? তার ছেলের শখ মিটবে, আবার টাকা পয়সারও সুরাহা হবে কিছুটা। তার উপর একটার যায়গায় দুটো ছেলে হলে তো সোনায় সোহাগা। ভাগাভাগি করে নিতে পারবে। দিতে না চাইলে প্রসবের সময় একটাকে আগে সরিয়ে দেবে। কিন্তু এই মুহূর্তে এসব কথা বলা যাবে না ওকে। তবে বান্ধবীর সখ সে যে কোন উপায়ে মেটাবে, মনে মনে ঠিক করে ফেলে সুজাতা।

—কিরে, কথা বলছিস না যে? সুজাতাকে চুপচাপ থাকতে দেখে নয়নতারা তাগাদা দেয়।

সুজাতা হাসিখুশি মুখে বলল—ভাবছিলাম তোর সন্তানের কথা। ওষুধ খেয়ে না হয় পেটে সন্তান এলো, কিন্তু কি জবাব দিবি পাড়া-পড়শিদের কাছে? তোর নামে তো দুর্নাম ছড়াবে লোকজন। ঢি ঢি পড়ে যাবে সারা পাড়াময়। তখন কি করবি?

—সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। কীভাবে তাদের সামলাতে হবে তার পথ আমি খুঁজে নেব। সন্তান লাভের আশায় বদনাম, দুর্নামের পরোয়া না করে সরাসরি কথাটা বলে ফেলল নয়নতারা।

নয়নতারার চোখে চোখ রেখে সুজাতা বলল—মেয়ের তো খুব সাহস হয়েছে দেখছি।

—সে তুমি যা ইচ্ছে তাই বলতে পার। তবে সন্তানের জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। অকপটে নিজের মনের কথা বান্ধবীকে বলে ফেলল নয়নতারা।

ফটিকের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল সুজাতার। ফটিক আবার তার কাছে জানতে চাইল, পেটে একটা সন্তান সে পালন করবে কিনা?

তার কথা শুনে চোখদুটো পাকিয়ে সুজাতা বলল—তুই কি আমাকে খুন করাতে চাস নাকি? তুই জানিসনা, আমার স্বামী খুন হয়েছে। এখন যদি পেটে সন্তান আসে তাহলে সন্দেহের বসে গ্রামের লোকেরা আমাকে খুন করে ফেলবে।

সুজাতার মুখে কথাটা শুনে বিষণ্ণতায় মুখটা ভরে ওঠে। তা দেখে কথাটা পাড়ে সুজাতা। দুঃখ পেও না ফটিকদা! তোমার জন্য একটা ভালো খবর নিয়ে এসেছি আমি।

পুলকে চোখ দুটো নাচিয়ে ফটিক বলল—কি খবর! তাড়াতাড়ি বলো সুজাতাদি। অনেকদিন কোন কামধান্ধা নেই আমার। ছেলে বউ সব শুকিয়ে মরছে।

সুজাতা এক এক করে সমস্ত কাহিনিটা বলে। তার সাথে জুড়ে দেয় শর্ত। কোন কারণেই নয়নতারার কাছে বলা যাবে না শর্তের কথা। হাসপাতালে ওষুধ খাবার নাম

করে তাকে নিয়ে যেতে হবে কোলকাতায়। উইলে টিপছাপ নিতে হবে খুব সতর্কে। যেন কোনমতেই নয়নতারা কিছু জানতে না পারে। দুটি সন্তান হলে, একটি সন্তান দিয়ে দিতে হবে তাকে। আমি ছাড়া তার সাথে কোন লোকজন সাক্ষাত করতে পারবে না। পেটে দশ মাস শিশু পালনের জন্য পুরো দু'লাখ টাকা অগ্রিম দিয়ে দিতে হবে। টাকাটা ক্যাশে দিতে হবে।

এ ছাড়া আরো কিছু শর্ত আরোপ করল সুজাতা। সেসব শর্ত এককথায় মেনে নিল ফটিক। কারণ তার হাতে ঝুলে আছে তিন তিনটি কাজ। এক সিনেমার নায়ক তো একবছর ধরে ঝোলাঝুলি করছে তার কাছে। দশ লাখ টাকার লোভ দেখিয়ে রেখেছে তাকে। নার্সিংহোমের খরচা আলাদা দেবে। তার মধ্যে তিন/চার লাখ টাকা খরচা হলে কি এসে যাবে? বাকি টাকাটা তো নিজের পকেটে আসবে। ছেলেপুলে নিয়ে খেয়ে পরে বাঁচা যাবে।

সুজাতা মনে মনে ভাবল, ফটিকের কাছে টাকাটা পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা তারাকে দেওয়া যাবে না। টাকাটা হাতে দিলে নানান প্রশ্ন করবে নয়নতারা। এটা কিসের টাকা? কোথায় পেলে? কেন আমাকে দিচ্ছ? কেন আমি নেব? ভীষ্মের শরশয্যার মত হাজারো প্রশ্নবানে বিদ্ধ করে তুলবে। তবে নয়নতারার এই টাকা সে একপয়সাও মারবে না। পরিবেশ, পরিস্থিতি, সময় বুঝে তার প্রাপ্য টাকা তার হাতে বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগে....।

সেকথা ভেবে একদিন কথায় কথায় সুজাতা তার প্রিয় বান্ধবী নয়নতারাকে বলল— আমি খোঁজখবর নিয়ে এসেছিরে তারা। কোলকাতার নার্সিংহোমে ছেলে হবার ট্যাবলেট পাওয়া যায়। তবে মাথাব্যথা, পায়খানা, অম্লের ট্যাবলেটের মত তা খাওয়া যায় না। নার্সিংহোমের ডাক্তার বাবুরা তা খাবার ব্যবস্থা করে। কয়েকবার সেখানে যেতে লাগে। একটু কষ্টও সহ্য করতে হয়। তুই...।

কথাটা আর শেষ করতে পারল না সুজাতা। তার আগেই বলতে শুরু করল নয়নতারা। আমার যত কষ্ট হয় হোক। আমি তার পরোয়া করি না। শুধু আমার একটা সন্তান চাই। যে আমাকে মা বলে ডাকবে। সবসময় আমার পাশে থাকবে। আমাকে শাসন করবে। ভালোবাসবে। আদর করবে। সুজাতাদি! তোমার পায়ে ধরি, মিনতি করি, তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও আমার জন্য। আর অন্য কিছু চাই না।

কথাটা আর শেষ করতে পারল না সুজাতা। তার আগেই বলতে শুরু করল নয়নতারা। আমার যত কষ্ট হয় হোক। আমি তার পরোয়া করি না। শুধু আমার একটা সন্তান চাই। যে আমাকে মা বলে ডাকবে। সবসময় আমার পাশে থাকবে। আমাকে শাসন করবে। ভালোবাসবে। আদর করবে। সুজাতাদি! তোমার পায়ে ধরি, মিনতি করি, তুমি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও আমার জন্য। আর অন্য কিছু চাই না।

ব্যবস্থাটা করে দিল সুজাতাদি। আড়ালে থেকে ফটিক তার করণীয় কাজ সারল। দু-চারবার সুজাতার সঙ্গে খুশি মনে কোলকাতায় যাতায়াত করল নয়নতারা। ফুল ছোঁয়ানি মেয়েদের কাছে সুজাতা রটিয়ে বেড়াল, তারার স্বামী বিহার থেকে ফিরে এসেছে। এখন সুখে ঘরকন্না করছে দুজনে। মত্ত আছে প্রেম ভালোবাসায়। ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। ওকে এখন সবসময় কাজেকর্মে পাওয়া যাবে না।

সুজাতার গসিপ রটে গেল মহিলামহলে। দুটো মাস যেতে না যেতেই নয়নতারা উপলব্ধি করতে পারল পেটে জন্মানো সন্তানের উপস্থিতির কথা। আনন্দে উচ্ছ্বাসের সাথে সে কথা জানালো সুজাতাদিকে। সুজাতা একদিন নিজের বাড়িতে ডেকে সাধ খাওয়াল। পেটের সন্তানকে কিভাবে সুস্থ সবল রাখতে হবে সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় টিপস দিল। কোন ভারি কাজ করা যাবে না বলে সতর্ক করল।

পেটের দায়ে ক'দিন পরে ফুল ছোঁয়ানি কাজে যোগ দিল নয়নতারা। সহকর্মী মেয়েরা তাকে ধরে বসল মিস্টি খাওয়াতে হবে। মালতি তার ছোট ছোট চোখ দুটো নাচিয়ে বলল—তারা! তোর বরকে একদিন আমাদের দেখা। কেমন বর দেখি।

নয়নতারা কি বলবে না বলবে ভেবে উঠতে পারছিল না। কাছেই কাজ করছিল সুজাতা। কথাটা কানে গেল তার। মুখে কতকটা বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে বলল—তারার বরকে এখন কোথায় দেখতে পাবে মালতিদি! বাবু ওর পেটে সন্তান গছিয়ে দিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হয়েছে। মুখপুড়িটা ওই জ্বালায় মরছে এখন। নিজে খেতে পায় না, পেটের সন্তানকে খাওয়াবে কি? সেই চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন।

কৌশলের সাথে কথাটা বলে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সুজাতা। পরে যাতে তারাকে আর অস্বস্তির মধ্যে পড়তে না হয়, সেই কারণে অনেক ভেবে চিন্তে কথাটা বলল। সেকথা শুনে মন ভার সকলের। তাদের মুখে হাসি ফোটাতে সুজাতাদি বলল—দুঃখ পেও না কেউ। তারা কথা দিয়েছে ওর সন্তান হলে সকলের মিস্টিমুখ করাবে।

এভাবে দিন গড়াতে থাকে। মাস আসে যায়। দশমাস পূর্ণ হবার কিছুদিন আগে সেই নার্সিংহোমে নয়নতারাকে ভর্তি করে দিয়ে আসে সুজাতা। সেখানে তার একটা ফুটফুটে পুত্র সন্তান হয়। দুদিন পরে নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পায় নয়নতারা। বিল

মেটাবার কথা জিজ্ঞেস করতে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বলে, বিল নিয়ে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

অগত্যায় ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে নয়নতারা। তার বুকের দুধ কম হচ্ছে শুনে রোজানি একপোয়া গরুর দুধের ব্যবস্থা করে দেয় সুজাতা। দেখতে দেখতে আরো তিনটে মাস গড়িয়ে যায়।

সমস্ত এই প্রক্রিয়ায় তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল ফটিক। ছেলে হবার পর সুজাতার বাড়িতে যাতায়াত বেড়েছিল তার। কবে ছেলেকে হস্তান্তর করবে তাই নিয়ে মাঝে মধ্যে সুজাতাকে খুব উত্যক্ত করছিল ফটিক। সেদিনও কাজে বেরোবার আগে দুয়ারে এসে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে বলল—ছেলেটা আজই আমার হাতে দিতে হবে। না হলে....।

সুজাতা ভেবেছিল নয়নতারার দুটো সন্তান হলে একটিকে সে দিয়ে দেবে ফটিকের হাতে। কিন্তু সে গুড়ে বালি পড়েছে। এখন যদি নয়নতারার কাছে কথাটা বলতে যায় তাহলে সে মাথা খুঁটে মরবে। প্রাণ যায় যাবে, তবুও পেটের ছেলেকে সে কখনই দিতে চাইবে না। তার পেটটা যে কয়েক মাসের জন্য ভাড়ায় নেওয়া হয়েছিল, সেকথা বুঝবে না সে। ফটিকের পুরো টাকাটা এখনো গচ্ছিত আছে তার কাছে। তাই তিতি বিরক্ত হয়ে সুজাতা বলল—না হলে কি, খুন করবে? আমরা তো দুর্বল মানুষ। লোকবল, অর্থবল কিছুই আমাদের নেই। তাই পথেঘাটে আমরা খুন হয়ে যেতে পারি। কিডন্যাপ হয়ে যেতে পারে ছেলেটা। তবে তার আগে তুমি তোমার দেওয়া টাকাটা নিয়ে যেও। সে টাকা আমি নয়নতারাকে দিতে পারিনি আজও।

ফটিক আর দেরি করেননি। সুজাতার বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে পুরো টাকাটা গুনে নিয়ে গেল। কিন্তু অর্থবান বাবুদের পরামর্শে কোর্টে একটা অভিযোগ দায়ের করে দিল। অভিযোগ তদন্তে এসে দারোগাবাবু জানতে পারলেন নয়নতারা আসলে একজন অশিক্ষিত গাঁয়ের মেয়ে। প্রচলিত 'সরোগেসি' শব্দটা সম্বন্ধে তার কোন ধ্যানধারণা নেই। কোথায় তার হাতের টিপ ছাপ নেওয়া হয়েছে তাও বলতে পারল না সে। তবে একটা মজার কথা সে দারোগাবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল।

দারোগাবাবু—আমরা প্রতিদিন খেতে গিয়ে পটল ফুলে পরাগ জল ছোঁয়াই। আমাদের সেই ছোঁয়ানো জলের কারণে প্রচুর পটল হয় খেতে। তাহলে আমরাও তো দাবি করতে পারি সব পটল আমাদের। একটা দুটো ওষুধ খাইয়ে যদি পেটের ছেলেকে দিয়ে দেবার কথা বলে, তাহলে...।

সেকথার কোন জবাব না দিয়ে দারোগাবাবু ফিরে গেলেন থানায়। পরে একটা রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দেবেন কোর্টে। তাতে কোর্ট যা সিদ্ধান্ত নেয় নেবেন।

বঙ্গ-দর্পণ

বিকাশকান্তি মিদ্যা

এই পথে বেদের মতে

মাঘ-ফাগুনের ন'টা দশটা বেলায় হঠাৎ হঠাৎ পান্ডা এসে হাজির হতো গ্রামে। পুরী বা গয়া থেকে আসলে পান্ডা,আর বৃন্দাবন-আগত হলে ব্রজবাসী।

এই ব্রজবাসী,পুরীর পাণ্ডা বা গয়ার পান্ডা এরা সব আজকের দিনের কুন্ডু ট্রাভেলস, ভ্রমণ, কিংবা চলো যাই। এরা সব সংস্থা, পান্ডারা এক একটা ট্রাভেল এজেন্ট।

কারুর সাত পুরুষ, তো কারুর তিন পুরুষের পাণ্ডাগিরির কারবার। পকেটের ডায়েরী বা নোটবুকে মক্কেলদের সাকিন ঠিকানা সব লেখা থাকে। জানা থাকে, পৌষে ধান ওঠার পর মাঘ-ফাগুনে গেলে গ্রামের মানুষের হাতে পয়সা আঁে। অতএব নতুন করে সব শুরু করা যায়।

গ্রাম মুড়িয়ে সবাই তো আর যায় না, পৈতৃক সম্পত্তি অঢেল যার, তার কথা আলাদা। মোটামুটি গোলায় যার ধান ফুরায় না সম্বৎসর, কেনা বা কর্জ করতে হয় না,অথচ কর্জ দিয়ে সুদে কিছু আয় হয় নিয়মিত কিংবা ধোষার হাটে রানিং দোকান যার, তারাই পারে তীর্থ করতে যেতে। তবে টাকা থাকলে হয় না, মন চাই। মনে না বেড়ানো থাকলে, তীর্থের নেশা, ঘরে বসে টাকার আট পিঠ চাটাই সার হয়।

নুন আনতে পান্তা ফুরায় যাদের বা ভাড়ানি কিংবা ভানকির দল যারা, তারা অবশ্য এসব কল্পনায় আনে না। তাদের দেখে সুখ। কেবল দেখা নয়, প্রাপ্তিও জোটে। এক পেট খাওয়া।

গয়া,পুরী,বৃন্দাবন;বিশেষ করে গয়া ফেরত মানুষরা ফিরে এসে পাড়া-প্রতিবেশীদের এক সাঁজ খাওয়ায়, একে বলে 'গয়ার খাওয়া'। বাবা-মায়ের কেউ, এমন কী দু'জন মারা যাওয়ার পর মানুষ গয়া যায়, সেখানে মৃত মানুষের জন্যে প্রেতগয়াতে পিণ্ড দান করতে হয়। এটাই রীতি, কিন্তু সবার পক্ষে গয়ায় যাওয়ার সঙ্গতি কোথায়?

যারা পারে না, তারা, যায় যারা তাদের হাতে পায়ে ধরে। যদি তার মৃত বাবা, মা বা নিকট আত্মীয় কারুর নামে একটা পিণ্ড দিয়ে দেয়, তবে চিরটা কাল কেনা হয়ে থাকে। স্বাভাবিক মৃত্যুতে তো পিণ্ড দেয়ই, অপঘাতে মরলে দেওয়াটা আবশ্যক। খাওয়ানোর

এত কিছু বোঝার বয়স নাকি তখন? পেটভরা একসাঁজ খাওয়া পেলেই প্রাণ ভরে যায়। বেদ- পুরাণের ধার ধারে কে? দোলে প্রতি বছর মাস্টার বাড়িতে এক বেলা নিমন্ত্রণ পেতো গ্রামবাসী। সেদিকেই আমাদের হাপিত্যেশ তাকানো। শেষ পাতে ঘোলের মতো দইয়ের আশায় দস্তার গ্লাস নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকা। এর মাঝে যদি এক আধটা গয়ার খাওয়া হয় কিংবা যাত্রাকালীন বিদায় খাওয়া জুটে যায়!

পিছনে এই পারলৌকিক কর্মের একটা কারণ থাকতো হয়তো; নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে পার্টি দেওয়ার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে অত খোঁজে কাজ কী? ওই বয়সে বাড়ির সবাই মিলে একবার পেট ভরে খেতে পাওয়ার লোভ সামলানো কঠিন।

সে খাওয়া তো গয়া থেকে ফিরে আসার পর।

যাওয়ার আগে একটা অনুষ্ঠান হতো। সেটা মূলত আত্মীয় স্বজন আর সীমায়িত পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থাকতো। বৈদিক সংস্কারের এক লুপ্তপ্রায় অভিনয় সেখানে অভিনীত হতো। কত জন আর জোগাড় করতে পারতো ব্রজবাসী বা পুরী-গয়ার পান্ডা? হাতে গুনে চার- পাঁচটা পরিবার বা মানুষ। তাও আট-দশটা গ্রাম হন্যে হয়ে। আমাদের গ্রামে সে সৌভাগ্য মাস্টার বাড়ির। মাঠের জমি, আবাদ চাষ, ধোষায় কাপড়-বাসনের দোকান, তার উপর মাস্টারি। সে বাড়ির বুড়ো-বুড়ি তীর্থ করতে যাবে না তো কে আর যাবে?

কিন্তু গেলে তো হবে না, বার্দ্ধক্যে বারাণসী। বৈদিক চতুরাশ্রমের চারদশা—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—বিংশ শতাব্দীর অন্তিমপর্বেও জীবাশ্মের মতো থেকে গেছে।

এত কিছু বোঝার বয়স নাকি তখন? পেটভরা একসাঁজ খাওয়া পেলেই প্রাণ ভরে যায়। বেদ- পুরাণের ধার ধারে কে? দোলে প্রতি বছর মাস্টার বাড়িতে এক বেলা নিমন্ত্রণ পেতো গ্রামবাসী। সেদিকেই আমাদের হাপিত্যেশ তাকানো। শেষ পাতে ঘোলের মতো দইয়ের আশায় দস্তার গ্লাস নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকা। এর মাঝে যদি এক আধটা গয়ার খাওয়া হয় কিংবা যাত্রাকালীন বিদায় খাওয়া জুটে যায়!

সাত ভাইয়েদের বাড়ি কিংবা মাস্টার বাড়ির উঠোন জুড়ে বাধা হতো মেরাপ। মাথা মুড়িয়ে মাস্টারের বৃদ্ধ বাবা কিংবা সাতভাইদের বাবা সস্ত্রীক নিতেন গেরুয়া বাস। লাঠি না লাগলেও নিতে হতো যষ্টি। বানপ্রস্থ বলে কথা, হোক অভিনয়। বেদের পথ। গলায় উঠতো ভিক্ষার ঝুলি। উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যেতে হতো তীর্থযাত্রীদের, বলতে হতো,

ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী, ভিক্ষা লয়ে যাব কাশী। তাদের গলায় আওয়াজ কতটা উঠতো বলা মুশকিল। এ অনুষ্ঠানে নাম-সঙ্কীর্তনের দল বাধ্যতামূলক। তারা ওই ধুয়া নিয়ে গেয়ে যেত গান। সেই সঙ্গে 'এই পথে বেদের মতে'। আর তাদের সেই একঘেয়ে গানের সুরে, আত্মীয়-স্বজনদের সারিবদ্ধ ভাবে ভিক্ষা দেওয়ার বহর দেখে চারপাশে কেমন বিদায়ের আবহওয়া তৈরি হতো। সবার চোখ মুখে কেমন আসন্ন বিদায়ের কান্নার ছায়া। দেশ গ্রাম থেকে সচরাচর কেউ তো তেমন কোথাও যেত না বাইরে দূরে, তাই কারুর যাওয়া দেখলে এমনই মেঘ করতো মনে।

কেবল মাস্টারের বাবা-মার মুখে কুলুপ আঁটা। তাঁরা যে হাসি-কান্নার ঊর্ধ্বে। তাঁদের কান্না মানে তো বেদকে অসম্মান করা। ভারতীয় শাশ্বত সংস্কারকে অপমান করা। অতএব, যাও হে সংসারপথযাত্রী,অনন্তের পথে।

সারা পাড়া নামসঙ্কীর্তন দলের পিছন পিছন বিদায় জানাতে চলে যেত রাস্তা পর্যন্ত।

আর আমার সে কী কান্না,ওই বয়সে বোঝা না বোঝার দোলায় বেদের নিয়মের ফাঁকিটা তো ধরতে পারতাম না, ভাবতাম, এই যে মানুষগুলো যাচ্ছে, এরা বুঝি আর ফিরবে না কোনোদিন। নিয়ম নেই ফেরার।

বেদের সত্যতা আর পালনের এই ফাঁকি কি আর বুঝেছিলাম নাকি সেদিন?

যেমন বুঝতে পারিনি, মায়ের চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাসের অর্থ!

মাস্টারের মাকে দিদিই ডাকতো মা, আমরা ডাকতাম আদুরী মাসি। আদুরী মাসির সুখে হিংসা করতো না মা, বড়ো বাড়ির গিন্নি তো, তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতো, শরিক হতে চাইতো।

পরে বুঝেছি ওই কান্না আর দীর্ঘশ্বাস শরিক না হতে পারার।

'অভাগীর স্বর্গ' কীভাবে পূরণ হয়, তার অপেক্ষা !

কলকাতায় টাকা ওড়ে

কার্তিক মাসে রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুকুর ডাকলে বুড়োমা বলত, মড়ক লাগবে। রাতের আঁধারে নিম গাছে ভুতুম পেঁচা ডাকলে সেও একই ব্যাখ্যা।

আমানি জোটানো দায়, ভুট্টা মাইলো ছ'মাসে ন'মাসে কবে মেলে তার নেই ঠিক। সেও প্রধান অয়েদ আলির দয়া দাক্ষিণ্যের ব্যাপার।

এসবের ভিতর মাঠে একবার ফসল ফলে। সেই দিকে সবার তাকিয়ে থাকা। সে পঞ্চাশ বিঘের মালিক যেমন, এক ছটাকের কারবার নেই যার তারও। মালিক,ভাগচাষী, দিনমজুর। সবাই উদাসীন মাঠ প্রত্যাশী।

তবে মাঠে থাকা ধানের উপর ভরসা রাখা দায়! কোনো বছর ধান গোলা পর্যন্ত আসে তো কোনো বছর শূন্য। অনাবৃষ্টি যেমন আছে, অতিবৃষ্টিও কম যায় না। অথচ বিকল্প কোনো

উপায় নেই বাঁচার। অন্য কাজের কোনো সঙ্গতিও নেই। ভানকি তো আর সবাই নয়।

এ অবস্থায় কলকাতা নাকি স্বর্গ। খবর আসে,সেখানে টাকা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। ধরতে পারলে হয়।

বউয়ের যা ছিল সে সব তো গেছে বন্ধকে, এক দু'কাঠা জলজমি বা চাষজমি সেও। আয়ের কোনো উৎস নেই, অথচ ছ'টা পাত পড়ে সকাল দুপুর সন্ধে। খাওয়ার লোক আছে, গতর আছে, কাজ নেই।

কিন্তু হাজার দারিদ্র্যেও বাস্তু ছাড়তে রাজি নয় কেউ, মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে থাকতে ক্ষিদেও একপ্রকার গা সওয়া হয়ে যায়। গতর খাটা মানুষগুলো হাপিত্যেশ হয়ে গ্রীষ্মের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, বর্ষা কবে নামবে। বর্ষা নামলে চাষ শুরু হবে,কাজ জুটবে সেই আশায় যেন বেঁচে থাকা।

কিন্তু আশা তো আর ক্ষুন্নিবৃত্তি মেটায় না, তাই জমির মালিকদের দারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। গ্রীষ্মে টাকা নিয়ে বর্ষার মাঠে কাজ করে শোধ দেয়। আবার কার্তিকে টাকা নিয়ে ধান কেটে তুলে দেয় পৌষে।

কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট মানুষগুলোর সবাই কি আর চাষের কাজ পারে নাকি? লাঙল চষার গায়ের জোর মুখের কথা নয়, দেড়-দু'মন ধানের বিচালি বহনের ক্ষমতা সবার হয় না। রোদে পুড়ে, বর্ষায় ভিজে, শীতে হিম হয়ে টিকতে পারে না যারা, তাদের অবস্থা শোচনীয়।

অন্যের কাছে হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই; না হলে ঘটি, বাটি, মাটি, আর তা না হলে বৌয়ের হাতের চুড়ি, পায়ের মল, নাকের নোলক বা নথ, নিদেন টপ, কানের মাকড়ি না হলে দুল, গলার হার মায় কোমরের দড়া বা বিছাহার বন্ধক দেওয়া বাধ্যতামূলক। কখনো বা ষোল আনা গতরটাও।

বিয়ের সময় কন্যা বিদায়কালে হাজার গরীব হোক বাবা-মা, মেয়ের নাকে-কানে বা হাতে-গলায় কিছু না দিলে জামাই মেলা দুষ্কর, মেয়ে বা ভাবে কী, বাবা-মা খালি হাতে আপদ চুকালো? সব সময় যে আছে, তাই সাজিয়ে দেয়, তা নয়; দেয় ওই গরীবের ক্ষুদকুড়ো, এক সময় বিপদের সম্বল হয়ে দাঁড়ায়।

চার মেয়ে এক ছেলের বাবা নবকুমার কাকার হয়েছে আচ্ছা জ্বালা। বড়ো মেয়ে বামনীর বিয়ে দিয়ে কপর্দক শূন্য মানুষটা যে জায়গা-জমি চাষ করবে সে গুড়ে বালি। জয়নগরের মুখার্জীদের ভাগচাষী। জমিদারি যাওয়ার আগে আগে মন্ডলদের সাত ভাইয়ের কাছে আর হাজরাদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ায় ভূমিশূন্য নবকুমার। অথচ বত্রিশের বর্গা তাদের দুই

ভাই নবকুমার আর পঞ্চমের নামে। তাদের নামে পাট্টা জমি তাদেরকে বঞ্চিত করে কী করে অন্যকে বিক্রি করে, সেই মর্মে মামলা করা আছে। মেয়ের বিয়ের খরচ তো আছে সেই সঙ্গে মামলার খরচ। মামলা চালাতে বন্ধকের ব্যবসা ফেঁদে বসার উপায়!

বউয়ের যা ছিল সে সব তো গেছে বন্ধকে, এক দু'কাঠা জলজমি বা চাষজমি সেও। আয়ের কোনো উৎস নেই, অথচ ছ'টা পাত পড়ে সকাল দুপুর সন্ধে। খাওয়ার লোক আছে, গতর আছে, কাজ নেই।

বড়োদের কাজ নেই বলে কি ছোটোদের খেলা নেই? ক্ষিদে মেটানোর এত বড়ো ওষুধ বাচ্চা থেকে কিশোর-কিশোরী পাবে আর কোথায়? আমাদের চণ্ডীমন্ডপ তখন সব রকমের খেলার আখড়া। সকাল থেকে সারাটা দিন বাচ্চা-বুড়োর হৈ-হুল্লোড়ে বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নেই চণ্ডীমন্ডপের। সন্ধের পর শান্ত। সন্ধের পর সেখানে বাচ্চার টিকিটা দেখা ভার।

কারণ আর কিছু নয় ব্রহ্মদত্যির ভয়। পাড়ার সবচেয়ে উঁচু দুই তালগাছের ঠিক মাঝ বরাবর আমাদের চণ্ডীমন্ডপ। ওদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমাদের কুঁড়ের পুকুরের তালগাছ, তো উত্তর-পূর্ব কোণে অজিত কাকাদের তালগাছ। আর এদের ঠিক মাঝ বরাবর চণ্ডীমন্ডপ। গায়ে গায়ে নয়, আমাদের কল্পনা উপযোগী একটা ব্রহ্মদৈত্যের প্রমাণ সাইজের দূরত্ব। বিবেকানন্দের শৈশবের সেই চাঁপাগাছের ব্রহ্মদত্যি না, এ সম্পূর্ণ আমাদের দেশি। বাবা-কাকা, মা-পিসিমাদের কাছে শোনা, দুই তাল গাছে পা রেখে চণ্ডীমন্ডপের চালের উপর চৌকিতে বসে নিজেরই পৈতা মাজেন বাবাঠাকুর। এ সময় নিচ দিয়ে কেউ গেলে সমূহ বিপদ।

এ সব শোনার পর রাতে চণ্ডীমন্ডপের তল্লাটে আসার সাহস আর কোন বাচ্চা পায়?

রাতে না হোক, দিনে আমাদের হলকজোয়ারি বা কলরোলে ভরপুর জায়গাটা। নবকুমার কাকার দুই মেয়ে সীতাদি আর গীতা এর মধ্যমনি। কানামাছি, বৌবসন্তি,সোনাপুঁতি, ছাগলচরানি,ভিক্ষা দেবে গো, কুমীর কুমীর, কাঠ কাটি করাত কাটি, চোখ ফুটাফুট মালি, কত না খেলা! দশ-বারো বছর বয়স পর্যন্ত খেলায় কোনো লিঙ্গভেদ নেই। তবে দুধভাত ছিল। একেবারে বাচ্চার কোনো দল নেই, তার সব সময় খাটনি দেওয়ার দল থেকে ছাড়।

তবে খেলোয়াড়দের মধ্যে সীতাদির দক্ষতায় আর গীতার হুড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতায় ওদের কাছে পেরে ওঠা দায়। বাদ দিতে চাইলেও ওদের বাদ দেওয়া দায়। তাহলে খেলা না, যেন লবণ ছাড়া খাওয়া। তবে এসবের ভিতর বিভূতি পিসেমশাইয়ের ছেলে গৌতম বা উত্তমকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলে, আমাদের কেন যেন শান্তি বেশি। দু'জনে যেমন মায়াবি, তেমন মিথ্যা কথার শিল্পী। তার সঙ্গে ছিল একটু চৌর্যবৃত্তির ধাত। ওদের মা ঊষাপিসির এ দক্ষতা ছোট থেকেই ছিল শুনেছি, বিভূতি পিসেমশাই অদক্ষ ছিল না। ছোট থেকেই শুনতাম পিসেমশাইয়ের দাদা ধনা ডাকাতের মাছি হতে পারার গল্প। এমন যাদের প্রেক্ষাপট, তাদের সুযোগ পেলে দোষী সাব্যস্ত করে জল বিছুটি দেওয়াও ছিল আমাদের

> শুনে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে জানালো, মেজ বৌদি, ভিটে ছাড়ার বড্ডো মায়া গো, কিন্তু তিনদিন বাচ্চাগুলোর কিছুই জোটেনি। চোখের সামনে মরা দেখার চেয়ে কালীঘাটে মায়ের কাছে যাই, সেই দেখবে। পিছু আর ডেকোনি বউদি, আশিব্বাদ করো, প্রাণে যেন বাঁচাতে পারি ওদের।

খেলার বা আনন্দ বিনোদনের একটা অঙ্গ। একাজে সন্তোষকাকার বৌ কাজল কাকি আর চটি পিসি হাত না লাগালে যেন জমতো না ব্যাপারটা।

তবে গৌতম-উত্তমের উপর এই 'কৃপা বর্ষণের' বা হেজিমনির কারণ একটা ছিল নিশ্চয়, তা আর কিছু নয়, বিয়ের পর থেকেই বিভূতি পিসেমশাই পরাশ্রয়ী। তার না ছিল কোনো ভিটে, না কোনো ঘর। শ্বশুরবাড়ির পাশেই বিধবা পদ্মঠাকুমার পরিত্যক্ত ঘরই হয় ওদের আসর,বাসর,আশ্রয়। এক রকম পাড়ার গলগ্রহ। গৌতম-উত্তম তার থেকে বাদ যায়ই বা কেন?

হাজার দারিদ্র্যের ভিতর এই নিগ্রহ আমরা সবাই উপভোগ করতাম। এমন কী,একবেলায় না খেতে পেলেও ক্ষতি হতো না তাতে।

সেভাবেই চলছিল, কিন্তু কত দিন? যৎসামান্য আমানিটুকুও যখন চেয়েও মেলে না, তখন বাঁচার বিকল্প পথ খুঁজতে হয়। সে পথে নবকুমারকাকা-ই দায়িত্ব নিল সবার আগে। এ আর উনুনের ইন্ধন নয়, পেটের অন্ন, না জোটালে নয়।

গ্রাম্য অ্যামেচার যাত্রা দলে গায়কের কাজ করতো নবকুমার কাকা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ গেছে। পুরাতন সে দলও উঠে গেছে কবে। আর তাড়ি পান করে করে গলাটাও ধরেছে, অথচ এখনও কার্তিকের ভোরে শ্যামাসংগীত শুনে ঘুম ভাঙলে বোঝা যায় নবকুমার কাকা গান গাইছে। 'দে মা আমার তবিলদারি, আমি নেমকহারাম নই মা শংকরী'।

কিন্তু শংকরী যে এমন ছেঁড়া তবিল হাতে ধরাবে বুঝবে কে?

কানাঘুষোটা খেলার আসরে চলছিল। সীতাদি-ই বলছিল। অন্যরা যদিও আটা হোক, মাইলো হোক, তার জাউ খেয়ে আসছিলাম আমরা, গীতার মুখ ভার। কেন কী হলো? না, তিনদিন পার হলো, উনুন জ্বলেনি তাদের। এখানে আর থাকবে না তারা।

এমন কথা তো সবার মুখে মুখে প্রায়। কিন্তু শুনে আমার কান্না আসার জোগাড়। ছুটে গিয়ে মায়ের কাছে বলবো কী, কেঁদে কেটে একাকার।

কিন্তু আমার কান্নায় কী এমন শক্তি যে ভুট্টা-মাইলোর দিন পাল্টায়? আলাদীনের চিরাগ তো নেই, থাকলেও যে খুব কাজ করতো মনে হয় না। মায়ের কথা মান্য করে নবকুমার কাকা। মা বোঝালো, শুনলো,শুনে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে জানালো,

মেজ বৌদি, ভিটে ছাড়ার বড্ডো মায়া গো, কিন্তু তিনদিন বাচ্চাগুলোর কিছুই জোটেনি। চোখের সামনে মরা দেখার চেয়ে কালীঘাটে মায়ের কাছে যাই, সেই দেখবে। পিছু আর ডেকোনি বউদি, আশিব্বাদ করো, প্রাণে যেন বাঁচাতে পারি ওদের। ভিটেটুকু রইলো, মানিক থাকলো, ওরে একটু দেকো।

অনেক পরে দেখা চিৎপুরের কোনো সামাজিক যাত্রা পালার আবেগমথিত ডায়ালোগ নয়, তেড়েল মানুষটার তিনদিনের উপোসী কথাগুলো আরো কঠিন বাস্তবতা নিয়ে ফিরে এসেছিল আমার কৈশোরের মধ্যে। দেখা হবে সে কৈশোরের সঙ্গে।

তবে এবারের বিদায়টা আর বেদের মতে হলো না। যাযাবরের মতো হলো।

কার্তিকী কালীপুজোর তিনদিন আগে থেকে অলক্ষীর ঘরপোড়ানোর হিড়িক পড়ে যায় এ তল্লাটের গ্রামে। শুকনো তালপাতা কিংবা তালপাতা শুকিয়ে,তার সঙ্গে শুকনো কলাপাতা, খেজুর পাতা দিয়ে রেড়ি গাছের খুঁটি বানিয়ে ঘর বানানো হয় পুকুর পাড়ে। সন্ধের মুখে মুখে লাগানো হয় আগুন। আগুনের শিখা উঠে যায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে। সেটাই রেষারেষি। কার আগুন কত উঁচুতে উঠলো। সারি সারি ঘরগুলোর জ্বলন্ত শিখা পুকুরের জলে প্রতিফলিত হয়ে, সে এক অপূর্ব দৃশ্য! এর সঙ্গে আছে কলাগাছের মান্দাস বানিয়ে তাতে আগুন দিয়ে পুকুরের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত টানা। বাচ্চাদেরই খেলা, কার্তিকের সূর্যটা মাথা থেকে নামতে না নামতে শুরু হয় আয়োজন। বড়োরাও বসে থাকে না। হাত লাগায়। খাওয়া জুটুক না জুটুক, এটুকুতে বাঁচা।

কালীপুজোর আগে প্রথম দিনের ঘর বানানোর প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে, বিন্দুমাত্র জায়গা ছাড়া যাবে না অন্যের ঘর বানানোর জন্যে। দূর হটো,তফাৎ যাও। হঠাৎ কান্নার রোল। বাঁশরীকাকিমার। পঁচিশ বছরের দাম্পত্য কাটানো শ্বশুরের বাস্তু ছেড়ে কলকাতায় বেরিয়ে পড়েছে সব। মানসিক প্রস্তুতি ছিলই, কিন্তু সেটা যে আজ এই ঘরপোড়ানোর দিন, কে আর ভেবেছিল!

নবকুমার কাকা সবার আগে, সীতাদি তারপর। ছোট সবিতাকে কোলে নিয়ে বাঁশরীকাকি কেঁদে কেঁদে বিদায় নিচ্ছে জ্ঞাতি-প্রতিবেশীদের থেকে। গীতা সবার শেষে। মুখে কোনো কথা নেই। ঘর বানানোর কথা তারও ছিল। দূর থেকে সীতাদি একবার জোরে বলে উঠলো, তাড়াতাড়ি এসো মা,গীতা তাড়াতাড়ি আয়, বাস আসার সময় হলো।

অলক্ষীর ঘর পোড়ানোর সেই আসন্ন আলো আজকের পড়ন্ত বিকেলে ঝুপ করে নিভে গিয়ে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আনলো।

পুরো অন্ধকার নয়, শীতের দিনের দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে বিকেলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মন খারাপের যে আলো ঘিরে ধরে চারপাশ, তেমনই আলোতে চারটে মানুষ কলকাতার উড়ন্ত টাকা ধরতে বেরিয়ে গেল বাস মোড়ের দিকে।

আর গল্পে শোনা শহরটা তার লেলিহান জিহ্বটা প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বাড়িয়ে দিলো আমাদের গ্রামটাকে গ্রাস করার জন্যে।

বঙ্গ-দর্পণ

আবুল বারী

শাদির সাতকাহনের একটি উপপর্ব

ছোট চাচার বিয়ে। বাড়িতে উৎসবের মেজাজ। আমাদের ছোটদের মধ্যে আনন্দের ভাবটা যেন আরও বেশি। বরযাত্রী যাওয়ার কথা ভেবে মনে মনে সবাই উত্তেজিত।

গরুর গাড়িতে করে বিয়ে করতে চলেছে বর। সার বেঁধে চলেছে গরুর গাড়ি। সবার সামনের গাড়িটা বরের। তাগড়া বলদের সুন্দর ছই দেওয়া। বিয়ের দু'দিন আগে থেকে যাদের গরুর গাড়ি আছে তাদের বলে রাখা হয়। যার গরু বেশ সুন্দর, স্বাস্থ্যবান সেই গাড়িতে বর যেত। বিয়ের দিন সকালে গরু দুটিকে ভালো করে স্নান করিয়ে, সিং এ তেল মাখিয়ে লাল ফিতে বেঁধে দিয়ে সাজানো হত। গাড়ির উপর বিছিয়ে দিত খড়, তার উপর শীতলপাটি। তখনকার দিনে পটমিনে বিয়ের কসমেটিক, শাড়ি ইত্যাদি নিয়ে যেত। গাড়ির মধ্যে বর মুখে রুমাল দিয়ে বসত আর তার সামনে থাকত এই পটমিন।

মাঠের মধ্য দিয়ে চলেছে সার সার গরুর গাড়ি। শীতের বেলা। ধানকাটা শূন্য মাঠ শুয়ে আছে। দিগন্তের কোলে খণ্ড মেঘ অলস ঘুমে অচেতন। দূরের গ্রামগুলো ধোঁয়া ধোঁয়া গাছে ঢাকা। গরুর পায়ের খুরের আঘাতে ধুলো উড়ছে। এলোমেলো বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই ধুলো। দূর থেকে কোন মুনিস কাজ করতে করতে হেঁকে জিজ্ঞাসা করে কার বিয়ে গো, কোন্ গাঁয়ে যাবে? গাড়োয়ান বলদের লেজে মুড়াদিয়ে হেঁকে হেঁকে উত্তর দেয়। বাতাসে কথা ভেসে ভেসে দূর-দূরান্তে উড়ে যায়।

আমরা কয়েকজন ছেলেমানুষ ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ির পেছনের বাঁশ ধরে ঝুলতে থাকি। কাঁহাতক গাড়ির ভিতর বসে থাকা যায়। উঁচু-নিচু মেঠোপথ। গাড়ির দুলছে ঢেউ পড়া নৌকার মত, গাড়ির ভেতর বসে থাকা দায়। গাড়ির মধ্যে মাথায় মাথায়, কখনোবা ছইএর বাতায় ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে। তার চেয়ে গাড়ির বাওড় (গরুর গাড়ির পিছনে একহাত মত বেড়ে থাকা বাঁশ) ধরে ঝুলবাজি খাওয়া অনেক ভালো। কখনো গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মেঠো পথ ধরে গাড়ির আগে আগে ছুটতে থাকি। ছেলেমানুষের দুরন্ত পা। এক ছুটে আমরা গাড়ী থেকে অনেকটা এগিয়ে যাই। রাস্তার পাশে নয়ান জুলি। বর্ষায় জলে ভরে থাকে। এখন শীতকাল। সামান্য জল। কিন্তু কাঁচের মতো টলটলে। জলের নিচের মাটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সেই মাটির উপর শুয়ে

আছে শামুক, গুগলি। ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে কাঁকড়া। কোথাও গো-খাবরিতে (গোষ্পদ) বা একটু খাদ মতো জায়গায় স্থির পাখনায় বসে আছে চেং, ছিমুড়ি মাছ। নালার একপাশে এই গো-ডহর (মেঠো পথ) আর অপর পাশে জমি। সেই জমির ধার থেকে জলের কাছাকাছি জলজ ঘাস নেমে এসেছে। জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বা জলজ লতাগুল্ম। কলমি লতা অভিমানী মুখে লতিয়ে আছে। এখন শীতকাল। বর্ষার ভরা জল নাই। নাই ঢেউ-এর দোলুনি, নাচানাচি। বর্ষায় ঢেউএ নাচা তরুণী কলমির এখন অল্প জলে তার নাচন বন্ধ। তার উপর শীতের দাপট তাকে কাবু করেছে। বর্ষার সময়ের মতো দেহে তেজ নাই। এখন অধিকাংশ পাতা লালচে, বার্ধক্যের ছাপ। তাই বুঝি কলমিকন্যা অভিমানী।

নালার ধারে কোথাও কোথাও পাটকাঠি পোতা। মাটি থেকে দুই আড়াই হাত উঁচু। তার ওপর বসে আছে ফড়িং। জলে তার ছায়া পড়েছে। জলে পোঁতা পাটকাঠি যেটা সোজা, তাকে মনে হয় বাঁকা। আর বাঁকা পাটকাঠির ছায়া কেমন যেন সোজা লাগে। কোথাও বা শরতে ফোটা, হেমন্তের ঝরে যাওয়া কাশফুলের শুকনো ডাটা। ঝাড় ঝাড় শুকনো কাশের ওপর লাল লাল ফড়িং বসে। ফড়িং এর উপর আমার ভীষণ লোভ। শুধু আমার কেন আমার বয়সী গ্রামের সব ছেলেদেরই এই ফড়িং ধরার নেশা। মশা মারার মতো হাত দুটো এক জায়গায় করে ফড়িং ধরা হয়। তবে হাতের পাতা দুটো একসঙ্গে লেগে যায় না। তাহলে ফড়িং চিঁড়েচ্যাপ্টা। তাই দুই হাতের তালুর মাঝে ফাঁক রেখে হাত দুটো এক জায়গায় করা হয়। দুই হাতের মুঠোয় ধরা পড়া ফড়িং ফরফর করে। ছেলে মানুষের শরীরে এক অদ্ভুত পুলক খেলে যায়। বিজয়ের হাসি ফুটে উঠে মুখে। মানুষের সত্তা কি অদ্ভুত। এক নিরীহ প্রাণী প্রাণের দায়ে ছটপট করে আর আমরা পুলক অনুভব করি। বিজয়ের হাসি হেসে উঠি। নিষ্ঠুর খুনী, ফ্যাসিস্ট শাসকরাও বুঝি মানুষ খুন করে, মানুষের উপর অত্যাচার করে, বাঁচার আকুতিতে তাদের ছটফটানি দেখে এমনই পুলক অনুভব করে। তৃপ্তি পায়। তা না হলে হাজার হাজার মানুষকে খুন করে, গৃহহারা করে তাদের কি সুখ?

গরুর গাড়ির আগে আগে আমরা ছুটে চলেছি। কখনো ফড়িং ধরছি, কখনো মাছের তপস্যায় বসে থাকা কানাবকের উপরে ঢিল ছুঁড়ে নিশানা পরীক্ষা করে তার ধ্যান ভেঙ্গে দিচ্ছি। কোথাও পড়শীহীন ব্যথাতুর বাবলা গাছ একটুখানি করুণ ছায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডালে ডালে শালিক, ফিঙে আর ঘুঘু মধ্যদুপুরের ঝগড়া নিয়ে ব্যস্ত। জগতের প্রায় সব প্রাণীর মধ্যে ঝগড়া মারামারি করার প্রবণতা আছে। তবে আমার মনে হয় মানুষের মাঝে এই প্রবণতা তীব্র ও মারাত্মক। পাখিরা ঝগড়া করে, হুটোপুটি করে আবার গলায় গলায় ভাব করে আকাশে ডানা মেলে। আর মানুষরা কোন দিনকার বলা গোপন কথা ঝগড়ার সময় সবার সামনে ব্যক্ত করে তৃপ্তি পায়। কখনো বা রক্তদর্শনের আগে ক্ষান্ত হয় না। ভাষা যুক্ত প্রাণী মানুষ শুধু শারীরিক শক্তি

প্রয়োগে ক্ষান্ত হয় তা নয়, ভাষা প্রয়োগেও জখম করতে চায়। দাঁত, নখের সাথে জিহ্বাকেও প্রয়োগ করে। আর এই কথার মার জগতের বার। শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত চিরকাল দগদগে হয়ে থাকে। পাখিদের কথাও নাই, কথার আঘাতও নাই। তাই সহজেই সব ভুলে গলাগলি করে আকাশে ডানা মেলতে পারে।

আমাদের ছোটার গতিতে ধুলো ওড়ে। হাঁটু পর্যন্ত পা সাদা হয়ে যায়। গ্রামে ঢোকার মুখে বড় বটগাছ। তার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। গাড়ি আসে আপন গতিতে।

গাড়ি এসে বটতলায় দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে বড়রা ধমক দেয়। বলে ছুঁড়ারা তো বড় বেয়াদব। এই তোরা সব ওঠ গাড়িতে। ধুলোতে কি অবস্থা? একটা মানুষের বাড়ি যাচ্ছিস তো নাকি? এভাবে কেউ নোংরা হয়ে যায়? আমরা হাত-পায়ের চিকন বালি ঝেড়ে আবার গাড়িতে উঠে পড়ি।

বিয়েতে যাওয়ার এই মজা সেই ছোটবেলায় কয়েকবার পেয়েছি। তারপর তো দিনকাল পাল্টাতে লাগল। গরুর গাড়িতে করে এখন আর কেউ বিয়ে করতে যায় না। এখনকার দিনে সব পাল্টে গেছে। স্করপিও গাড়ি ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সারি সারি টাটাসুমো চলে বরের সঙ্গে। গো-শকটের পরবর্তী পর্যায়ে চালু হয়েছিল একটা টাটা সুমোর সঙ্গে বাস বা ৪০৭ গাড়ি। এখনো অবশ্য বাসে বরযাত্রী যাচ্ছে। গো-শকট পর্বে বা তার আগে আরেকটি জিনিস ছিল। এখন একদমই নাই বললেই চলে। পাল্কি। পাল্কি এখন বইয়ের পাতায় ছড়া ও ছবি হয়ে রয়ে গেছে। বিশ পঞ্চাশটা গ্রাম খুঁজলেও বোধহয় একটা আস্ত পাল্কি এখন আর পাওয়া যাবে না। এখন বেহারও নাই,পাল্কির গানও নাই। ছোটবেলায় দুটি বিয়েতে পাল্কিতে বর-কনের যাওয়া দেখেছি। একটা ছিল আমার এক আত্মীয়ার বিয়ে আর একটি পাশের গ্রামের কোন এক মানুষের। এখন ঠিক মনে নাই। আমার আত্মীয়ার বিয়ের পর পাল্কিতে চলেছে। আমরাও কয়েকজন ছোট ছেলে পাল্কির পিছন পিছন ছুটছি। বেহারারা হু-হুম -নারে, হু-হুম-না শব্দের সাথে সাথে গানও করছে। দুরন্ত তাদের চলা। আমরা ছুটছি তাদের পিছু পিছু। তবে বেশিদূর যেতে পারিনি।

নববধূ বসে আছে পাল্কির ভেতর। আলো আঁধারে ঘেরা পরিবেশ। সদ্য পরিচিত হওয়া মুখোমুখি দুটি প্রাণ। দু চোখে কত স্বপ্ন, কত কৌতূহল। কেমন এক লাজ-রাঙা ভাব। সবুজ মাঠের মাঝে দিয়ে চলেছে পাল্কি। কখনোবা সারি সারি তাল গাছে ঘেরা দিঘীর পাড় ধরে চলেছে। আর পাল্কির ভেতর দুজন মানুষ স্বপ্ন বুনছে আগামী ভবিষ্যৎ জীবনের। সবুজ মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের স্বপ্নের রঙ।

প্রসঙ্গত বিবাহ যাত্রার আরেকটি বিষয় নিয়ে এখনে বলে নিই। যা এখন দেখা যায় না বললেই চলে। রেলগাড়িতে বিবাহ যাত্রা। আমার এক পাড়াতুতো চাচা রেলগাড়িতে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। আমার জন্মের আগের ঘটনা। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি

তার বিবাহ করতে যাওয়ার কথা বলেন। তাঁর কথার পরিবেশনটা ছিল চমৎকার। মাঠে ধানের জমিতে নিড়ানি চলছে। ভাদ্র মাস। আকাশ মেঘলা। কখনো মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ছে। বাতাস বইছে মৃদু মন্দ। ভাদ্রের গুমোট গরম ভাব সেদিন ছিল না। খুব জোরদার কাজ চলছে মাঠজুড়ে। মুখে গল্প আর হাতে কাজ। কথা প্রসঙ্গে ওঠে বিবাহের কথা। মাঠে কাজ হলে বিবাহ বা আদিরসাত্মক গল্প বেশি হয়। সেদিন কথা হচ্ছিল কে কতদূরে বরযাত্রী গেছে। কিসে চড়ে গেছে। এইসব কথা হচ্ছিল। হঠাৎ চাচা সবাইকে থামিয়ে দেন। বলেন এইসব চুপ। কে তুরা রেলগাড়িতে বিয়ে করতে যাওয়া দেখেছিস বা গেছিস? অনেকগুলো মুনিস কাজ করছিল। সবাই চুপ। চাচা বলেন আমি গেলছি। গেলছি কিরে আমি রেল গাড়িতে চেপে বিয়ে করি এসিছি। বর সেজি, বরযাত্রী লিয়ি রেলগাড়িতে বিয়ি করি এসিছি। তুরা সব গরুর গাড়ি বাস-লরির কথা বুলছিস। কেউ পারবি আমার মুতুন রেলগাড়িতে বিয়ি করতি যেতি? আমরা সবাই চুপ।

একজন মানুষ বলে তুমার শ্বশুর বাড়ি কোথায় ? চাচা বলেন লালগোলা স্টেশন থেকি নেমি একটু দূরে গ্রামে। চাচা বলেন বাড়ি থেকি বর সেজি বরযাত্রী লিয়ি গরুর গাড়িতে গেলাম বেলডাঙা স্টেশন। সবার জন্য টিকিট কাটা হল। তারপর আমি আর কয়েকজন উঠি একটা কামরায়। বাকিরা যে যেখানে পারল উঠে পড়ল। সবাই গিয়ে নামে লালগোলায়। চাচার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেমন এক আত্মতৃপ্তি ঝরছে সে মুখ থেকে। আরো অনেক কথা বলে চলে চাচা। বিয়ে করে বউ রেলগাড়িতে বাড়ি আনা হয়। বাসর রাতের কথা আসে। মুনিসদের মধ্যে উৎসাহ বেড়ে যায়। আর আমি এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ি। চাচা কি বলতে কি বলে বসে তার ঠিক কি। মাঠে-ঘাটে কাজ করতে করতে আদি রসের কথা শোনার রেওয়াজ আছে। রসের কথা মানুষ বলতে ও শুনতে ভালোবাসে। আমি তখন কলেজ পড়ুয়া। মাঠে মুনিস যে এসব কথা বলে তা জানি। শুনেছিও কোন কোন দিন। কিন্তু আমার খুব পরিচিত মানুষের মাঝে এ সব শোনার অভিজ্ঞতা নাই। বেশ লজ্জা লজ্জা, অস্বস্তিকর পরিস্থিতি আমার। এর মাঝে একটা মুনিস বাসর রাতে কি কথা হয়েছিল, তোমাদের মধ্যে কে আগে কথা বলেছিল, ঘরে হারিকেনের আলো কেমন ছিল এসব জানতে চায়। চরম উৎসাহ। প্রশ্নের বান ডেকেছে। হাতের কাজের গতিও বেড়েছে বেশ। এক আবেগি বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে ধানক্ষেত জুড়ে। সবাই চুপ। উৎকর্ণ হয়ে আছে। শুধু ধানের জমিতে অল্প জলে হাত দিয়ে ঘাস তুলে নেওয়ার একটা আওয়াজ হচ্ছে। ছপছপ আওয়াজ। সবাইকে অবাক করে দিয়ে চাচা গেয়ে ওঠেন 'এই রাত তোমার আমার /ওই চাঁদ তোমার আমার/শুধু দুজনের/এই রাত শুধু যে গানের/এই ক্ষণ এ দুটি প্রাণের/কুহু কুজনের/এই রাত তোমার আমার।' প্রথমে গুনগুন করে তারপর বেশ উদাত্ত গলায়

গেয়ে চলেন। 'দীপ জ্বেলে যায়' ছবির হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এই গান আগে কতবার শুনেছি, কিন্তু এ শোনার অনুভূতিই আলাদা। বাতাসে ভাসতে ভাসতে সুর চলেছে কোন সুদূরে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি। পুরো গানটা গেয়ে চাচা থামলেন। আমরা নির্বাক। এমন পরিবেশে এমন গান খাপছাড়া। তবে সেদিন খাপছাড়া লাগেনি। বরং দারুণ এক মোহজাল বিস্তার করেছিল। যেসব মুনিস একটু আদি রসাত্মক কথা শুনতে চেয়েছিল তারা আর সে পথে গেল না। কেমন এক আবেশ সবার চোখে-মুখে। আর চাচা যেন সেই বাসর রাতে স্বল্পালোকে চাচির সামনে বসে আছেন। দু চোখে কেমন এক ঘোর। মুখের উপর ভাদরের মেঘ-রোদের মতো অতীত দিন, সেই বাসররাত ছায়া ফেলে যাচ্ছে। এমন সব মানুষ যারা মাঠে-ঘাটে কাজ করে খায়, গুছিয়ে জীবন নিয়ে যাদের ভাবার সময় নাই তারাও যে এমন রোমান্টিক হতে পারে চাচাকে না দেখলে বোঝা যেত না। তখনকার দিনে যারা শহুরে মানুষ, নিজেদের আধুনিক বলে দাবি করেতেন তারাও হয়তো বা এমন ভাবে বাসররাত উদযাপন করতে পারতেন কিনা বা নববধূকে এমন গান শোনাতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে।

ছোটবেলায় দেখেছি আমাদের গ্রামে বিয়েতে কোন প্যান্ডেল হতো না। হলেও খুব বড়লোকদের বাড়িতে। তাও এখনকার মতো এমন জাঁকজমকপূর্ণ নয়। সাধারণ বাড়িতে তখন উঠোনে শামিয়ানা খাটানো হত। খেজুরের বা তালপাতার পাটি পেতে বরযাত্রীদের বসতে দিত। অবশ্য বরের বসার জায়গা ছিল একটু স্পেশাল। বাড়ির উঠোনে পাটি পেতে খাওয়া-দাওয়া। শালপাতা কিংবা দশালি থালায় খাওয়ানো হতো। আগের দিন গ্রামীণ সমাজে রান্নার বড় বড় হাড়ি ডেক্‌চি খুন্তির সাথে সাদা সাদা বা ফুল করা টিনের উপর নিকেল দেওয়া বাসন কিনে রাখত। সাধারণ গরীব মানুষরা শালপাতা কিনত না। এই বাসন এনে মানুষকে খেতে দিত। আবার ধুয়ে পরিষ্কার করে গুনে গুনে সমাজের নির্দিষ্ট মানুষের কাছ জমা দিত। এখন বিয়ে বাড়ির চেহারা গেছে পাল্টে। দুদিন আগে থেকে বিরাট প্যান্ডেল বাঁধা হয়। রাস্তা থেকে বাড়ি পর্যন্ত লাইট জ্বলে। টুনি বাল্বে ঘরবাড়ি সাজায়। আর তার সঙ্গে বেজে চলে কান ফাটানো গান। ফুল ভলিউমে বেজে চলে বক্স। দুই হাত দূরের মানুষের কথা শোনা যায় না। এমন আলো-লাইট-বক্সে শব্দ না হলে বিয়ে মানায়! হোক না শ্বশুরের গলায় পা দিয়ে আদায় করা টাকা। বিয়ে তো জীবনে একবারই হয়। তা মাত্রা ছাড়া না হলে মানায়! মানুষ টেবিল-চেয়ারে খাবে, ক্যাটারাররা খাওয়াবে। দরকারে হাতে হাতে আগেভাগে মেনু কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হবে। দেখে দেখে পড়ে পড়ে খাও। পড়তে না পারলে অন্যকে শুধাও। তবে ধীরে ধীরে আয়েশ করে খাওয়ার সময় নাই। আরও লোকজন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা উঠলে তারা বসতে পাবে। তাই গো-গ্রাসে গেলো।

আগের দিনে পাতপেড়ে মানুষ খেত। তাড়াহুড়া নাই। আস্তে আস্তে খাও, যা

লাগবে বল। নিজেদের লোক পরিবেশন করছে। যেমন চাইবে, যতবার চাইবে দেওয়া হবে। না চাইলেও বারবার জিজ্ঞেস করা হবে। অনুরোধও। আর একটা রসগোল্লা দিই, একটা তো? আরে না না অনেক খেয়েছি। কি আছে আর একটা খাও? এটা আমার অনুরোধ। খেয়ে অস্বস্তিতে পাড়তো কিন্তু আন্তরিকতায় মন ভরে যেত। অনেক দিন এই খাওয়ার গল্প চলতো।

এই খাওয়ার দলে কোন পেটুক থাকলে তো কথাই নাই। তার উপর নজর পড়তো সবার। আলাদা করে তার জন্য বালতিতে মাংস, ভাঁড়ে দই, মিষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে যেত লোক। একটা একটা করে পরিবেশন করা হতো। সেই ব্যক্তি মানুষের দিকে তাকাতো আর খেয়ে যেত। মানুষেরা বাহবা দিতো। খেতে উৎসাহিত করত। তার খাওয়া নিয়ে বেশ একটা মজা হতো। এইতো বিয়ের আনন্দ। খেয়ে, খাইয়ে আনন্দ। এত আয়োজন কি জন্য, খাওয়ার জন্যই তো। মানুষ খাবে, খুশি হবে। এটাই তো বড় খুশি, বড় পাওয়া।

এসব পাট এখন উঠে গেছে। বিয়েতে চাকচিক্য বেড়েছে। উপহার সামগ্রীর জৌলুস বেড়েছে। অনুপাতে কমেছে আন্তরিকতা। এখন আমাদের গ্রামে বিয়ে বা অন্নপ্রাশন বা অন্য কাজের জন্য অনুষ্ঠান বাড়ি ভাড়া করা হয়। একদিনের বা এক বেলার জন্য ভাড়া নাও, অনুষ্ঠান করো। কেমন যেন সব রেডিমেট। খুব নিকট আত্মীয় ছাড়া দূর থেকে আসা আত্মীয়-স্বজনকেও একবেলা খেয়ে চলে যেতে হচ্ছে। তাছাড়া এটাও ঠিক যে এখন গতির যুগ। সময়ের দাম খুব। বিয়েতে আনন্দ করার জন্য, খাওয়ার জন্য দু একদিন নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কত কাজ। আগের দিনে মানুষের হাতে কাজ ছিল কম। অবসর সময় দেখে বিয়ে জোড়া হতো। তাই অলস দিনগুলি আয়েশে খেয়ে কাটানো যেতো। এখন তা সম্ভব নয়। আত্মীয়তার আন্তরিকতা তাই সৌজন্যতায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ টুকুই বা কদিন টেকে সেটাই দেখার।

ছোট চাচার বিয়ে হয়ে গেলো। মাঝারি গড়নের বেশ সুন্দর একটি মেয়ে এলো আমাদের বাড়িতে। বাড়ির সবলোক, রাখাল, কিষাণ, বারো মাস বাঁধা মুনিস সবাই খুব আনন্দ করল, খাওয়া-দাওয়াও। শুধু বাড়ির গরু-বাছুরগুলো কদিন একটু অবহেলা ভোগ করলো। বড়মা তা নিয়ে খুব আফসোস করতে থাকে। বড়বাপ বলে হবে গো হবে, ওদেরও যত্ন হবে। তুমি একটু শান্ত হও বাপু। ওরা আমাদের অন্নদাতা, ওদের অবহেলা করতে পারি।

এখন এমন সরল মনের মানুষ পাগলের মত খুঁজি। পাইনা। মানুষ আছে, কেমন সব গুমরানো। মনের থই পাই না। পাড়া-পড়শী থেকে আত্মীয়রাও যেন কেমন দূরে দূরের। আত্মকেন্দ্রিক। ভালোবাসার নিবিড় ছোঁয়া, মধুর বন্ধন, কেমন সব আলগা এখন।

(ক্রমশ)

বইচর্চা

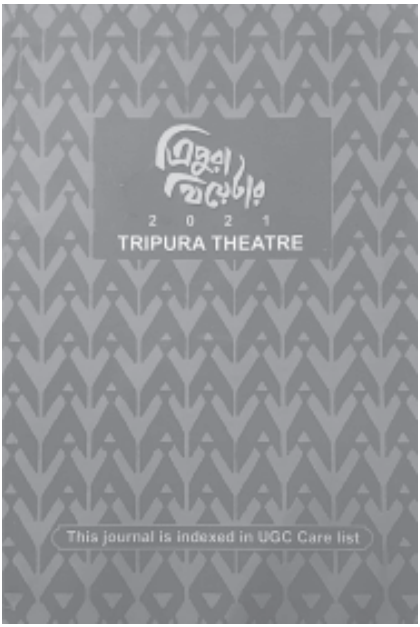

ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যগ্রন্থ, শারদ সংখ্যা ২০২১

নাট্যসংস্থার নাম ত্রিপুরা থিয়েটার, গ্রুপের প্রকাশনার নামও ত্রিপুরা থিয়েটার। এ যেন একে অপরের পরিপূরক। মঞ্চে যখন ওদের নাটক দেখি তখন মনে পড়ে প্রকাশিত বইয়ের কথা; আর যখন ওদের নাট্যপত্রিকা পড়ি তখন মনে পড়ে নাটকের কথা। এর চেয়ে স্থায়ী বিজ্ঞাপন আর কি হতে পারে! তবে দুটো ক্ষেত্রকেই সচল রাখার জন্যে প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি রাখা হয়নি দলের পক্ষ থেকে। এই প্রচেষ্টা আন্তরিক এবং অকৃত্রিম। তা না হলে ষোলো বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে কোনো নাট্যগ্রুপের পক্ষে বছরে ন্যূনতম দুটো নতুন প্রযোজনা করে নাটকের বই প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। সত্যিই নাট্যে নিবেদিত প্রাণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আলোচ্য বইটি পড়লে জানা যাবে কি করে একটি সাধারণ নাট্যপত্রিকা ধীরে ধীরে পনেরো বছরে জাতীয় স্তরে উন্নীত হয়। প্রথমত, বলে রাখা ভালো বইটি ইউজিসি কেয়ার লিস্টেড এবং ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউড। নাটকের গবেষকদের জন্যে এটি একটি বড়ো পাওনা। এবার আসা যাক দুই মলাটের ভেতরে কী কী পাওয়া যাবে সেই বিষয়ে আলোচনায়।

নাট্যগ্রন্থটি দ্বিভাষিক, বাংলা এবং ইংরেজি। ২০২২ সালের সংখ্যায় ইংরেজিতে রয়েছে তেরোটি প্রবন্ধ। বাংলায় ২৩টি। আর নাটক ১৪টি। ইংরেজি বিভাগে সেক্সপীয়রের

নাটকের পোশাকের ব্যবহার নিয়ে লিখেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অভিজিৎ সেন। স্টেজের সম্ভাবনার কথা বর্ণিত হয়েছে কেরালার আধুনিক নাট্যব্যক্তিত্ব চন্দ্রদাসনের কথনে। বর্তমানে ভারতের নাট্যক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণা নাট্যগ্রাম। এ নিয়ে লিখেছেন উড়িষ্যার সুবোধ পট্টনায়ক। ত্রিপুরার নাট্য সম্মিলনের প্রতিবিম্বন রয়েছে নাট্যব্যক্তিত্ব সঞ্জয় করের লেখায়। ইংল্যান্ডের এডওয়ার্ড বন্ডের ইন্টারভিউ নিয়েছেন অধ্যাপক সুরজিৎ সেন। শ্রীলঙ্কার folk traditions এবং performance aesthetics নিয়ে লিখেছেন ধনুস্কা ওয়াশিরা। উনিশ শতকের নাটক নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিবশংকর মজুমদার; সঙ্গে আরজুমান আরা। মনিপুরের বৈষ্ণব নাট্য বিষয়ক বিশেষ বীক্ষণ রয়েছে ননীকুমার সিং-এর। কর্তাল-চলম নিয়ে সন্তোষ সিং সহ আরও কেউ কেউ লিখেছেন। নিবন্ধগুলোতে এত বৈচিত্র্য! ভাবা যায় না।

বাংলা বিভাগে এই বৈচিত্র্য আরো বেশি। উৎপল দত্তের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি তো যে কোনো গবেষকের কাছে অনন্য সম্পদ। দীর্ঘদিন ধরে এটি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে (এবার নবম কিস্তি)। এছাড়া পবিত্র সরকারের সঠিক উচ্চারণ, নাট্যচিন্তার সম্পাদক রথীন চক্রবর্তীর থিয়েটারের বদল ঘটান, সৌমিত্র বসুর তত্ত্ব বনাম নাট্যশালা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অশেষ গুপ্তের প্রসঙ্গ নাটকের অনুবাদ, আদিত্য সেনের দিল্লীতে বাংলা নাট্যচর্চা, আশিস সেনের অজানা বীরসেন, অধ্যাপক ড. অপূর্ব দে'র শিশু পালাকার অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রভারতীর শান্তনু দাশের আমি মেকবেথ-ম্যাকবেথ মিরর, গ্রুপ থিয়েটারের সম্পাদক দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা থিয়েটারের প্রতিবাদী কণ্ঠ ও এই সময়, অধ্যাপক শুভঙ্কর ঘোষ রায় চৌধুরীর থিয়েটারে অনুবাদের তত্ত্ব, প্রশান্ত সেনগুপ্তের মা তুই ডাইনী বটেক, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মলয় দেবের অপ্রকাশিত জয় বাংলা নাটক বা অধ্যাপক নির্মল দাশের লোকনাট্যের সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক এসব গবেষণাধর্মী লেখা মুদ্রিত হয়েছে এখানে। রয়েছে আরও সব রচনা। ড. গৌরাঙ্গ দন্ডপাটের বুদ্ধদেব বসুর নাটক, অর্পণ দাসের গণনাট্য সংঘে ভাঙ্গন ও পুনর্গঠন, প্রসূন বর্মণের যাত্রা ও রামকুমার নন্দী মজুমদার, রত্নদীপ রায়ের নাট্য ও নৃত্য সম্পর্ক, অভী ঘড়াই এর অভিনয় ও বাদ্যযন্ত্র, বি এইচ ইউ'র ড. সুবীর ঘোষের মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চা, অঙ্কুশ দাসের বোলপুরের নাট্যচর্চা এবং অংকিতা ঘোষের প্রবীর গুহ'র নাট্যজীবন ইত্যাদি যেমন।

প্রবন্ধ ছাড়াও ১৪টি নানাস্বাদের বাংলা নাটক সংযোজিত হয়েছে বইটিতে। নাট্য কর্মীদের কাছে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। রয়েছে কমল রায় চৌধুরীর দেবোনা তিতুন। এটি ১৯৮২ সালের নাটক। বলা যায় এ হল, ১৯৪৫ থেকে ৫০ এ ত্রিপুরার জনজাতি জীবনের খণ্ড ইতিহাস। বিশিষ্ট নাট্যকার কুন্তল মুখোপাধ্যায়ের নাটক প্রিয়জন সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর সেতুস্বরূপ। প্রবীর গুহ'র তিতাস একটি নদীর নাম বাঙালি উদ্বাস্তুর পূর্ব পরিচিতির কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া শিবংকর চক্রবর্তীর করোনাকালীন সময়ের অভিজ্ঞতার

নাটক অনন্ত-র-অপেক্ষা, শিলচরের বিশিষ্ট নাটককার শেখর দেবরায়ের শ্রীহট্টীয় ভাষায় নাটক সুবলের কড়চা, অনুপ রায়ের শ্রুতিনাটক (মঞ্চেও অনায়াসে করা যাবে) খেলাঘর, আর্থার মিলার অনুসরণে মৈনাক সেনগুপ্তের খুব ভালো নাটক খনন কথা, গননাট্য পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল ভট্টাচার্যের তীব্র বাস্তবতার অসামান্য একটি ছোটোনাটক স্বপ্নচোর, শংকর বসুঠাকুরের কমেডি অন্তরাগ, সঞ্জয় আচার্যের চেক-মেট, মৃণাল দে'র জলই জীবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বইটিতে একমাত্র মহিলা নাটককার সঙ্গীতা চৌধুরীর নতুন শ্রাবণ অসামান্য সংযোজন। ত্রিপুরার কৃতি নাট্যকার পার্থ মজুমদারের প্রি-পেইড হোটেল খুবই সমকালীন। আর রয়েছে বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্যের নাটক Make India Great Again (MIGA)। নাটকটির পারফর্মেন্স আমরা দেখেছি। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ৪৫ মিনিটের একটি টানটান অন্তরঙ্গ প্রযোজনা। শুরুতে শঙ্খ ঘোষ, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত ও ত্রিপুরার শিল্পী চিন্ময় রায়ের প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে।

গত ৬ অক্টোবর ২০২১, নাট্যগ্রন্থ ত্রিপুরা থিয়েটারের ষোড়শ বর্ষীয় এবারের সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে এনএসডি, আগরতলা সেন্টারের ডিরেক্টর শ্রী বিজয়কুমার সিং বলেন, নাট্যকর্মীদের কাছে বইটি অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেকের পড়া উচিত। তা না হলে এত শ্রম, এত নিষ্ঠা বিফলে যাবে। অপর উদ্বোধক এসএনএ, ত্রিপুরা সেন্টারের ডিরেক্টর হরিনাথ ঝাঁ বলেন, ভালো নাটক করতে হলে গুণীজনদের অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করা প্রয়োজন। অতি উত্তমমানের এই বইটি ত্রিপুরার নাট্যক্ষেত্রের গর্ব। অতিথি, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, মহেন্দ্র গোস্বামী বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। শুনে তাঁরা সকলেই অবাক হন যে আমন্ত্রিত প্রত্যেক লেখকদের ৫০০ টাকা করে সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয় এবং এই রেওয়াজ ষোলো বছর ধরেই চলছে।

তবে এই নাট্যপত্রিকার অভিমুখ কি? সম্পাদকীয়টা পড়লেই ধারনাটা স্বচ্ছ হতে পারে। পত্রিকার সম্পাদক ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রী বিভু ভট্টাচার্য লিখেছেন: 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকালে আমরা কতটা অগ্রসর হতে পারলাম? প্রদীপ জ্বালিয়ে কাসর ঘণ্টা বাজিয়ে করোনা জয়ের নিদান দিলাম, গো করোনা গো! কত শত শব ভেসে গেল নদী বক্ষে, কে পূণ্যার্জন করলো, নদী না ঐ হতভাগ্যরা?... প্রতিবাদহীনতাকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য মানুষে মানুষে বিভেদ জিইয়ে রেখে সেই পুরনো কৌশলইতো চলছে। তবে মনে রাখা দরকার, মানুষের প্রতিরোধের হাতিয়ারও কিন্তু বৈচিত্র্যময়। সেক্ষেত্রে নাটকও ব্যতিক্রম নয় বরং আরো শক্তিশালী।'

ত্রিপুরা থিয়েটার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে সংস্থার ওয়েবসাইটে। পুরোনো সব সংখ্যাও আর্কাইভ করা আছে।

—পূর্ণেন্দু সিনহা

ত্রিপুরা থিয়েটার, ২৫০/-(ধ্যানবিন্দু, কলকাতা)

বইচর্চা

পাঁজির দর্পণে প্রতিবিম্বিত কলকাতা

পঞ্জিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই এমন বাঙালির সংখ্যা আজও অবশ্যই তেমন বেশি নয়। সময় নিজেকে বদলে নিয়েছে অনেকটাই; নিজেকে সজ্জিত করেছে নানা নতুন নতুন সাজে। তবু তার পরেও পঞ্জিকার মহিমা অক্ষুণ্ণ প্রায়। একক রচনা হিসাবে কাটতির দিক থেকে পঞ্জিকার জুড়ি মেলা ভার। আর সেদিনের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন পঞ্জিকার সাহায্য ছাড়া আমরা যেন একপাও অগ্রসর হতে অপারগ ছিলাম। তখন আমাদের সামাজিক জীবনে পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল স্বামী-স্ত্রীর মতো নিত্য ব্যবহারিক।

বিয়ে বা ওই জাতীয় বিশেষ বিশেষ সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, প্রতিদিনের যাপিত জীবনেও পদে পদে পা রাখতে হত পঞ্জিকার অঙ্গনে। জরুরি ভিত্তিতে কারও বিশেষ কোনো ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন। ব্যক্তিগত চেনাজানার নাগালে সেভাবে কেউ ধরা দিচ্ছেন না। তাহলে কি বসে বসে মাথার চুল ছিঁড়তে হবে। না, একদমই নয়। পঞ্জিকা তো রয়েছে। বিশেষ কোনো ডাক্তারের ঠাঁই ঠিকানার জন্য পঞ্জিকা হাতে দুটো মিনিট সময় ব্যয় করাই যথেষ্ট। একটা সুরাহা হবেই হবে। উদাহরণের শেষ নেই। ধর্মতলা থেকে শহর বা শহরতলীর কোনো স্থানে পৌঁছাতে হবে। বাসের সময় জানা নেই। পঞ্জিকা সরবরাহ করবে সে সংবাদ। এমনি করে সরকারি অফিস, বীমা কোম্পানির ঠিকানা, থানা-কোর্ট প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় বহন করেছে এক একটি পঞ্জিকা এবং আজও তার ব্যতিক্রম নেই।

আমাদের সামাজিক জীবনে পত্রিকার এই যে সর্বাত্মক অভিঘাত তা অনেক দিনাবধি আগ্রহের বিষয় হয়ে রয়েছে অধ্যাপক নিলয়কুমার সাহা-র। পঞ্জিকা বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। প্রকাশিত হয়েছে 'দুশো বছরের আলোয় গণজ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন',

'পঞ্জিকা বিজ্ঞাপনে বিস্মৃত বাংলা' প্রভৃতি গ্রন্থ। অধ্যাপক সাহার পত্রিকা বিষয়ক এই গবেষণার ধারায় সর্বশেষ সংযোজন 'বাংলা পঞ্জিকায় পুরোনো কলকাতা'।

'বাংলা পঞ্জিকায় পুরোনো কলকাতা' ষষ্ঠদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত একটি গ্রন্থ। এখানে ক্রমান্বয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে শহর কলকাতা থেকে বাংলা পঞ্জিকা প্রকাশের ইতিহাস, কলকাতার শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবহন, ডাকবিভাগ, পৌর প্রশাসন ইত্যাদি নানা বৃত্তান্ত। গ্রন্থনাম ও বিষয়বস্তুর বিন্যাস থেকে সুস্পষ্ট হয় গবেষণার এই পর্যায়ে গবেষক বিশেষভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছেন শহর কলকাতার উপর। দীর্ঘ দুই শত বছর ধরে কলকাতা শহর থেকে প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে একাধিক পঞ্জিকা এবং এই পঞ্জিকায় প্রথমাবধি জোর দেওয়া শহর কলকাতার ইতিবৃত্ত কথনে। একজন শাহরিককে সুস্থভাবে শহর জীবন যাপন করার জন্য নিয়ত যেসব প্রয়োজনের মুখোমুখি হতে হয় সেসব প্রয়োজনের পসার সাজানো হয়েছিল পঞ্জিকার পাতায়। গবেষক গভীর নিষ্ঠা সহকারে পঞ্জিকার জীর্ণ পাতার সমুদ্র মন্থন করে তুলে এনেছেন সেসব মণিমুক্তা; আহৃত উপাদান সমূহকে সজ্জিত করা হয়েছে চমৎকারভাবে।

'বাংলা পঞ্জিকায় পুরোনো কলকাতা' সন্দেহাতীতভাবে সুসম্পাদিত গ্রন্থ। 'কথামুখ' অংশে গ্রন্থকারের নিবেদন প্রণিধানযোগ্য—'দীর্ঘ দু-দশক স্থানীয় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় গণজ্ঞাপনের অন্যতম সুপ্রাচীন উপেক্ষিত এই গণমাধ্যম—বাংলা পঞ্জিকার কালজয়ী ভূমিকা পর্যালোচনায় নিবিষ্ট থাকার কারণে নজর এড়িয়ে যায়নি বাংলা পঞ্জিকায় প্রকাশিত কলকাতার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, ডাক-ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসন, আইন-আদালত, বিচার প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাদি। বাংলা পঞ্জিকা প্রকাশকদের এই মৌলিক প্রয়াসেই উদ্ভাসিত হয় গ্রাম কলকাতার তিলোত্তমা হয়ে ওঠার এক অনালোচিত ইতিহাস।' বলার অপেক্ষা রাখে না, এই অনালোচিত ইতিহাসের পাতাতে বিশেষ করে আলো ফেলতে চেয়েছেন গ্রন্থকার। তাঁর এই প্রয়াস সফল হয়েছে। শহর কলকাতার ক্রমশ ছোটো থেকে বড়ো হতে হতে অতি বড়ো হয়ে ওঠা ও তার ভিতরকার নানা ইতিবৃত্ত সুস্পষ্টভাবে আভাসিত হয়েছে এখানে।

যে কোনো পুরাতন বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রামাণ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থকার বিষয়টির প্রতি সমধিক দৃষ্টি দিয়েছেন। বজায় রাখা হয়েছে মূলের ভাষা ও বানানরীতি। গ্রন্থের 'সংযোজনী' অংশ অতি সমৃদ্ধ। এখানে সংযোজিত হয়েছে 'প্রাসঙ্গিক চিত্রে কলকাতা', 'ভারতবর্ষে প্রচলিত বিনিময়ের একক', 'শহর কলিকাতায় প্রকাশিত বাংলা পঞ্জিকা', 'বর্ণানুক্রমিক সূচি' শীর্ষক চারটি বিষয়। 'বর্ণানুক্রমিক সূচি' অংশটি গ্রন্থের নির্ঘণ্ট স্বরূপ। এর কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। 'শহর কলিকাতায় প্রকাশিত বাংলা পঞ্জিকা'-য় রয়েছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত যাবতীয় প্রচলিত ও অপ্রচলিত পঞ্জিকা বিষয়ক বিস্তৃত তথ্য। গবেষকদের কাছে এ এক বিশেষ উপঢৌকন।

— সম্পাদক

বাংলা পঞ্জিকায় পুরোনো কলকাতা : গ্রন্থনা ও সম্পাদনা—নিলয়কুমার সাহা, সেতু প্রকাশনী, ৫০০/-

বইচর্চা

মেয়েলি গীত : অন্য এক উদ্ভাসন

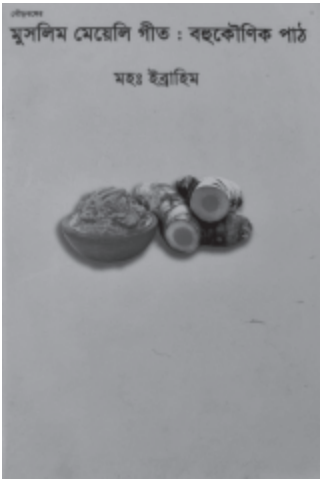

মেয়েদের, বিশেষত মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গীত লোকায়ত জীবন সংস্কৃতির এক অনন্য অধ্যায়। দুঃসহ সময় যখন প্রায় নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে লোকায়ত জীবনের নিজস্ব প্রাণশক্তিকে, লোকায়ত মানুষজন পরিণত হচ্ছে নেহাতই শিকড়হীন এক একজন ফাঁপা মানুষে তখনও যে দুই একটি বিষয়কে আশ্রয় করে আশাদীপ প্রজ্বলিত থাকছে মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গীত অবশ্যই তার মধ্যে অন্যতম। মালহদ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এসব জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজও গৌরবের সঙ্গে জায়মান রয়েছে বিয়ের গীত। বিয়ের দিন সাতেক আগে থেকে শুরু হয়ে যায় তোড়জোড়। অতঃপর বহমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যত সম্প্রসারিত হয় এর সীমানা ততই বাড়তে থাকে গানের বহর। একটা সময় তা চূড়ান্ত রূপ নেয়।

আমাদের লোকায়ত জীবন জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে থাকা এই যে মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গীত তা লোকসংস্কৃতি গবেষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল অনেক দিন আগেই। তাঁরা নিজেদের মতো করে এর ভাষ্য রচনা করেছিলেন; প্রণীত হয়েছিল মুসলিম বিয়ের গানে সমাজচিত্র (মনোয়ারা খাতুন), বাংলা বিয়ের গান (রত্না রশীদ), মুসলমান সমাজে বিয়ের গীত (শক্তিনাথ ঝা), মুসলিম বিয়ের গান, লসা আরসের গীদ' প্রভৃতি। অর্থাৎ মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গীতকে কেন্দ্র করে রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়। যতদূর জানা যাচ্ছে, রচিত এই গ্রন্থের ধারায় নবীনতম সংযোজন মহঃ ইব্রাহিম-এর 'গৌড়বঙ্গের মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গীত : বহুকৌণিক পাঠ'।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন নতুন করে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ। এমন প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর উপ্ত রয়েছে গ্রন্থনামের মধ্যেই। বর্তমান গ্রন্থ মুখ্যত গৌড়বঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত বিয়ের গীত বিষয়ক। এমনিতে বিয়ের গীত নিয়ে সামগ্রিক আলাপ আলোচনা

হলেও আলাদা করে গৌড়বঙ্গে প্রচলিত বিয়ের গীতের উপর সেভাবে আলোকপাত করা হয়নি। সেদিক থেকে এর বিষয়গত অভিনবত্ব থেকেই যায়। তাছাড়া অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের নিরিখেও এর নতুনত্ব স্বীকার্য।

'গৌড়বঙ্গের মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গীত : বহুকৌণিক পাঠ' বিন্যস্ত হয়েছে পাঁচটি অধ্যায় ও ততোধিক পরিচ্ছেদে। আলোচ্য বিষয়ের রূপরেখা এইরকম—শেরশাবাদী মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েলি গীত, শেরশাবাদী ভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েলী গীত, বিবাহের লোকাচার, মেয়েলি গীতের সমাজতত্ত্ব। আলোচ্য এই বিষয়সীমায় বিশেষ আকর্ষণীয় অংশ চতুর্থ অধ্যায়, সেখানে বিয়ের গীতের ভাষাশৈলী ও এর কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের অংশ বিশেষও আলাদা করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে হিন্দু, মুসলিম, মূলনিবাসী প্রভৃতি সমাজে প্রচলিত বিয়ের গীতের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে; যেখানে বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সাদৃশ্যের দিকও পরিস্ফুট হয়েছে বিশেষভাবে। জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের এই বাড়বাড়ন্তের দিনে যন্ত্রণাদগ্ধ মন পরিতৃপ্ত হয় সমন্বয়ের এমন বার্তা শ্রবণ করে। লেখক অতি যত্নের সঙ্গে আমাদের সমন্বিত জীবন সংস্কৃতির এই দিকটির উপর আলোকপাত করে বিশেষ সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিয়ের গান যাদের একান্ত নিজস্ব বিষয় তারা অবশ্যই এর ভাষা বা প্রকরণ শৈলী নিয়ে বিশেষ মাথা ব্যথা করেন না। কিন্তু যারা প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে বিচরণ করতে অভ্যস্ত তাদের দিক থেকে বিশেষ দায়বদ্ধতা থেকে যায়। লেখক ওই দায়বদ্ধতার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য দেখিয়েছেন এবং যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর এমন সচেষ্টতা স্থানে স্থানে সত্যিই অসামান্য হয়েছে—'গীতগুলিতে সুর ও লয়ের জন্য অ-এর পরিবর্তে ও-কার প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে দৃষ্ট হয়। যেমন—বাপ মায়ের>বাপোমায়ের; এক>একো, দাম>দামো, মাছ>মাছো; ইত্যাদি প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হয়। এ, সে সর্বনাম পদগুলিতে ও-কার প্রবণতার জন্য 'এও' বা 'ইও' সেও ব্যবহৃত হয়েছে।'

তবে এহ বাহ্য। গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে শতাধিক গান। গানগুলিতে বজায় রাখা হয়েছে এর নিজস্ব শব্দরূপ ও ধ্বনিরূপ—'তোমার জামাই **ভ্যাসলান** সাইকেল লিতে চাহে', 'আসুক স্বামী বসুক না, **খ্যাকই দ্যাইক রোহুক** না'। একদিকে যেমন আঞ্চলিক শব্দরূপ ও ধ্বনিরূপের অনুরণন রয়েছে অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেকটি আঞ্চলিক শব্দরূপ ও ধ্বনিরূপের মান্যরূপ তুলে ধরা হয়েছে পাদটীকায়। এতে এর গ্রহণযোগ্যতার সীমা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। আর এখানেও শেষ নয়। প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে বিশেষ ভাষ্য—'গীদটিতে অনন্য কাব্যগুণ লক্ষ করা যাচ্ছে। আরসের না অর্থাৎ কনের মা, তার দুয়ারে সিকি মরিচের গাচ হল কন্যার প্রতীক। ডালপাতে সুনগরভাবে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু মরিচ তুলতে হয় অর্থাৎ বিয়ে দিতে হয়। এবং ঘর খালি হয়ে যায়'। সবমিলিয়ে রচনাটি ভাস্বর হয়েছে নিজস্ব গুণে।

—আজিজুল হক

'গৌড়বঙ্গের মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গীত : বহুকৌণিক পাঠ' : মহঃ ইব্রাহিম, উড়ান, মালদাহ